A New Dream , A New Destination
www.shopnil.com
we request you to join our text and voice chat

This Book Download From
www.shopnil.com

যে নক্ষত্র--নক্ষত্রের দোষ
আমার প্রেমের পথে বার-বার দিয়ে গেছে বাধা

অপির বয়স যখন বছর ছয়েক, তখন তার প্রায়ই গাগরম থাকত। রাতে বোঝা যেত গায়ে জ্বর। মা-বাবা এ-নিয়ে আলোচনা করতেন।

অপি ছড়া বানিয়ে ফেললো—

বা কয় মা কয়
রাতের বেলা জ্বর বয়।

এই নিয়ে বাড়িতে কতো হাসাহাসি। কেউ তো তেমন করে গা করেনি, অতোটুকুন বাচ্চা মেয়ের টিবি হতে পারে! শুধু মা বলতেন, মেয়ে আমার শুকিয়ে যাচ্ছে। খেতে চায় না। পড়শিরা বলতো, আজকালকার ছেলেমেয়েরা এ রকমই। খেতে চায় না। পাখির আদার খায়।

অপি যখন শুনলো টিবির কথা, সে বললো, 'বাহবা কী মজা, আমাদের বাসায় টিভি আসবে! আমরা টিভি দেখবো।'

সে তার ভাই হ্যাপিকে জিজ্ঞেস করলো, 'ভাইয়া, টিভিতে কেমন করে বাস-ট্রেন ঢোকে?'

চিকিৎসাটা একটু দেরিতে শুরু হয়েছিল। কিন্তু আজকালকার দিনে এ-আর এমন কী অসুখ!

অপি ইশকুলে যাওয়া বন্ধ করে পরের বছর যথারীতি ক্লাস টু-তে ভর্তি হয়েছিল। অসুখের সময়টায় সে পড়াশোনা করেছে বাসায়, সুতরাং কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি ঘটলো না। শুধু তার শরীরের ভেতরে একটা সংকোচন ঘটে গেলো, যা কেউ জানতে পারলো না। অন্তত তখন। জানা গেলো প্রায় ১৬ বছর পরে।

কাঁদালে তুমি মোরে

অপির দু'চোখে এতো জলও ছিল!

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে অপি দেখতে পেলো পায়ের কাছে বিছানায় পড়ে আছে চারকোণা আলো, এক টুকরো। বোধহয় বিদ্যুত চলে গেছে। চাঁদের এই নীলচে কোমল আলোর টুকরাটা তাই বিনা বাধায় জানালা গলে ঢুকে পড়েছে ঘরে। ছুঁয়ে যাচ্ছে তার দু'টি পা, আর ক্রিমকালার রাত্রিপোশাকের লেসঅলা প্রান্ত। হাঁটু অবধি উঠে আছে ম্যাক্সিটা, চাঁদের আলোয় দুটো মোমের মতো পায়ে পিছলে যাচ্ছে জ্যোৎস্না।

অপি বালিশটার প্রান্ত বদল করলো। নিয়ে এলো জানালার দিকে। চিত হয়ে শুয়ে মাথাটা রাখলো বালিশে।

আকাশ দেখা যাচ্ছে, অনেকটা। জানালার চারকোণা ফ্রেমে বন্দি অনন্ত শিল্পীর আঁকা রাতের আকাশ। বিদ্যুতহীন রাতের ঢাকার আকাশ এতোটাই দর্শনীয়! সমস্ত চরাচর ঘুমুচ্ছে, ঘুমের চাদর ঢেকে দিয়েছে পুরোটা শহর, লোডশেডিঙের দোয়াত ঢেলে দিচ্ছে কতো কতো অন্ধকার, অথচ দেখো, কী জীবন্ত এই আকাশ। শাদা শাদা ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ দৌড়ুচ্ছে, যেন ছি বুড়ি খেলা, চাঁদের বুড়িটাকে ছুঁয়েই দিচ্ছে দৌড়! রাতের চাঁদে ধোওয়া আকাশ ঠিক নীল নয়, একে অপি কী রং বলবে! ধূপছায়া রং! অপি ঠোঁট বিড়বিড় করলো। নিজের সঙ্গে কথা কয়ে উঠলো!

চাঁদের আলো কি কাউকে ভিজিয়ে দিতে পারে! অপির মনে হচ্ছে, সে ভিজে যাচ্ছে জ্যোৎস্নায়। তার চুল সিক্ত, তার কপোলে ললাটে গণ্ডে শিশিরের মতো লেগে আছে চাঁদের আলো, বিন্দু বিন্দু। পরাগরেণুর মতো চাঁদের গুঁড়ো এসে পড়ছে তাঁর ওষ্ঠে ও অধরে, চিবুকে, তাঁর চিকন নাকের ডগায়।

চাঁদের আলোয় ভিজতে ভিজতে অপি তার বিছানায় মাথা রেখে দেখছে ওই আশ্চর্য মেঘদলকে।

কোত্থেকে আসছে এই মেঘগুলো! সুকান্তের রানারের মতো এতো রাতে ছুটে চলেছেই বা কোথায়! কার মনের গোপন বার্তা পৌঁছে দিতে চাচ্ছে কার কাছে!

এমনি মেঘদল একদিন ছুটে গিয়েছিল এক বিরহী প্রেমিকের বার্তা নিয়ে, এক বিরহিনী প্রিয়ার কাছে। কালিদাসের মেঘদূত কাব্যে। যক্ষ বুঝি এমনি ছুটন্ত মেঘ দেখেই মিনতি করেছিলেন তার মঙ্গলবার্তা বহন করার জন্যে।

অপি বিছানা ছাড়লো। দাঁড়ালো গিয়ে বারান্দায়। দোতলার বারান্দা। গ্রিল দেওয়া। একটা শিউলিগাছ দোতলা পর্যন্ত মাথা তুলেছে। হয়তো আলোর আকর্ষণে। গাছটায় ফুল ফুটেছে,

নিশ্চয়। অপি জোরে বুকভরে শ্বাস নিলো। আহ! সৌরভ! ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না! একলা জেগে রই!

বারান্দা থেকে যতোদূর দেখা যায়, চাঁদের আলোয় ভেজা আকাশের নিচে ঘুমন্ত ঢাকা শহর, তার দরদালান, ছায়া, অন্ধকার, পাতা এলানো গাছ, পাতারাও ঘুমুচ্ছে, মনে হয়, নিখিলে আর কোথাও কেউ নেই— নিচের বাগানে কী একটা পোকা কিট্‌কিট্ শব্দ করছে, কেটে কুরে খাচ্ছে সময়ের চৌকাঠ — আর বিশাল শূন্য আকাশে গতিময় মেঘের বিপরীতে লটকে আছে কৃষ্ণপক্ষের এক চাঁদ।

সেই নির্জন বারান্দায় গ্রিলে মাথা রেখে আলতো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক তরুণী। চাঁদের আলোয় গ্রিলের ছায়া জালের মতো পড়েছে তার গায়ে।

চোখের পাতা ভিজে আসছে।

অপি চোখের পাতা এক করলো।

চোখের ভেতরে জলচূর্ণগুলো একত্রিত হয়ে আকার নিলো ফোঁটার, টপটপ করে বেরিয়ে আসতে লাগলো পাপড়ি ভিজিয়ে।

অপির চোখের নিচে সামান্য কালচে দাগ আছে, সেই শ্যামল ছায়ার ওপরে বিন্দু বিন্দু জল জাফলঙের গাঢ় সবুজ পাহাড়ের গায়ে রুপোশাদা তন্বি ঝর্ণাধারার মতো ঝরতে লাগলো।

অপি কাঁদছে। কাঁদতে তার খুব ভালো লাগছে। কিন্তু এ যে বাঁধভাঙা জল! স্বপ্নভঙ্গ হলে নির্ঝর যে রকম প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ আর রুধে রাখতে পারে নি, রাশি রাশি শিলা খসিয়ে থর থর করে ভূধর কাঁপিয়ে ছুটে চলেছে বহে গেছে, তেমনি করে দু চোখ ভেঙে ফেটে ভেসে জল আসছে। অবিরাম! জলের ধারা চাঁদের আলোয় পথ চিনে চিনে, গণ্ডের উপত্যকা বেয়ে অধর ওষ্ঠ ছুঁয়ে যাচ্ছে। তার নোনতা স্বাদ এমনকি স্পর্শ করছে অপির জিভ।

অপি এক হাতে গ্রিল ধরলো। কান্নার দমকে তার শরীর কাঁপছে। তার শাদা পায়রার মতো শরীর ফুলে ফেঁপে বেঁকে যাচ্ছে। নাকের প্রান্তে, নীল নাকফুলের পাশে মাংস পর্দাগুলো ফুলে ফুলে উঠছে। সে কেঁপে কেঁপে শ্বাস নিচ্ছে। গলার ভেতরে বুকের ভেতরে বাষ্পরাশি, কী এক প্রক্রিয়ায় জলে পরিণত হচ্ছে, আর তার বুক ভেঙে আসছে, কণ্ঠে বসেছে পাথর।

কেবল কি নিঃশব্দ অশ্রুপাত, শিশিরের মতো!

না! গলার ভেতর থেকে উথলে উঠছে কান্নার ধ্বনি। অপি ফুঁপিয়ে উঠছে, গুঙিয়ে উঠছে।

এক সময় সে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো!

এখন কী করি! কেউ যদি দেখে ফেলে কাঁদতে! অপি তাড়াতাড়ি দৌড় ধরল বাথরুমের দিকে। লোডশেডিঙের অন্ধকারে দৌড়ুতে গিয়ে ধাক্কা খেলো দরজার কবাটের সঙ্গে। শব্দ হলো।

একই ঘরে, আরেকটি বিছানায় ঘুমিয়ে ছিলেন অপির দোর্দণ্ডপ্রতাপ দাদি। তার ঘুম পাপড় ভাজার মতো, পাতলা এবং ভঙ্গুর। তিনি জেগে উঠলেন।

'কে কে?'

অপি কথা বলছে না। কান্নার দমকে তার গলা থেকে অবিকৃত স্বর বেরুনো অসম্ভব। সে বাথরুমের প্রবেশপথ লক্ষ্য করে নতুন উদ্যমে দিলো ছুট!

www.shopnil.com

'কে কে? এই অপি, এই অপি। ওঠ তো। দেখতো কে।'

অপি দৌড়তে গিয়ে সোজা এবার ধাক্কা খেলো বিছানায়। হাঁটুতে বাড়ি লেগে সে পড়লো দাদির গায়ে।

'ও মাগো, খেয়ে ফেললো গো'— এতো তারস্বরে চিৎকার করে উঠলেন দাদি, যে, জানালার একটা কাচ ভেঙে পড়লো ঝনঝন শব্দে।

বাবা-মা ছোটোমামা আর হালিমা বুয়া যে যার ঘরে অন্ধকারে জেগে উঠলেন, হতচকিত, পরবর্তী কর্তব্য স্থির করার চেষ্টা করতে লাগলেন। এমন সময় চলে এলো বিদ্যুত। ঘরে জ্বলে উঠলো নীলরঙের ডিম লাইট। বারান্দায় বারান্দায় জ্বলে উঠলো আলো। নিচের বাগানের বড়ো আলোকস্তম্ভগুলো থেকেও আলো এসে ঢুকলো ঘরে ঘরে।

দাদি দেখলেন তাকে জড়িয়ে ধরে আছে অপি। তার দু চোখে জল। কেঁদে কেঁদে তার দু চোখ ফুলে উঠেছে। অশ্রুতে তার পরনের কাপড় বুক পর্যন্ত ভেজা।

দাদি বললেন, 'বুবু, তুই? কাঁদছিস!'

অপি কেঁদেই চলেছে। সে কোনো কথা বলতে পারছে না।

বাবা-মা ছোটোমামা আর হালিমা বুয়া ততোক্ষণে এ-ঘরে চলে এসেছেন। টিউবলাইট জ্বালানো হয়েছে। ধবধবে শাদা আলোয় তারা স্পষ্ট দেখতে পেলেন, দাদির কোলে ফুঁপিয়ে কাঁদছে নাত্‌নি।

ব্যাপার কী, তারা বোঝার চেষ্টা করলেন। ছোটোমামা ভীতু টাইপের লোক। ভয় পেলে তিনি তোতলাতে থাকেন। তিনি বললেন, 'ক্‌-ক্‌ কী হ-হ-হয়েছে?'

হালিমা বুয়া এই বাড়ির পুরোনো পরিচারিকা। তোতলামির কোনো ইতিহাস তার নেই। অথচ তিনিও তোত্‌লাতে লাগলেন। বললেন, 'ক্‌-ক্‌-কী হ-হ-হ-ই-ছে?'

অপি সংবিত ফিরে পাচ্ছে। না বোঝার কোনোই কারণ নেই যে অবস্থা খারাপ। টিউবলাইটের ধবধবে আলোয় সবাই দেখে ফেলেছে তারা জগৎপ্লাবী ক্রন্দনদৃশ্য।

এ দৃশ্য এ বাড়িতে খুবই অস্বাভাবিক। এই বাড়ির গেটে পাথর খোদাই করে লেখা আছে বাড়ির নাম— 'হাসিবাড়ি'। এই বাড়িতে সবাই হাসে, কেউ কখনো কাঁদে না। কান্নার মতো কোনো কিছুই এ-বাড়িতে সচরাচর ঘটে না। সেই বাড়ির মেয়ে হয়ে সে কিনা এইভাবে কাঁদছে!

অপি নিজেকে সামলে নিলো। বললো, 'কিছু হয় নাই।'

কিছু হয় নাই বলতে গিয়ে সে আবার ডুকরে উঠলো!

বাবা বললেন, 'কিছু হয় নাই! তাহলে এতো হৈ হল্লা কেন। আমি তো ভাবলাম বাসায় ডাকাত পড়েছে।'

ছোটোমামা বললেন, 'আ-মি-মিও তাই ভেবেছি। দু শ্‌ শ্‌ শ-চ-চ-রি-ত্র টাইপ ডা-ডা-ডা...

মা বললেন, 'বল্টু, তুই চুপ কর। যতো বাজে কথা সব সময় মুখে। যা ঘরে যা।'

ধমক খেয়ে মামার তোতলামি কমলো খানিক। বললেন, 'একজন জো-জো জোয়ান লোক তো থাকা দরকার। বিপদে আপদে জো-জো জোয়ান মানুষই তো ভরসা। রবীন্দ্রনাথ

বলেছেন, ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁ-কাঁ-কাঁ চা

বুয়া বললেন, 'কাঁ-কাঁ-কাঁচা কী? মুখের কথা জিবায় আটকাইয়া রাখলে আমার বুকের মধ্যে যন্ত্রণা করে! মনে হয় আপনেরে হেল্‌প করি। কাঁচা কী? কাঁচা মরিচ?'

অপি বললো, 'সবাই যার যার ঘরে যাও। অন্ধকারে বাথরুম খুঁজতে গিয়ে দাদিআম্মার ঘাড়ে পড়ে গেছি।'

'ও-হো-হো-হো।' বাবা ছাদ ফাটিয়ে হাসতে লাগলেন। ছাদটা অবশ্য সত্যি সত্যি ফেটে গেলো না এবং মাথায়ও পড়লো না। কারণ এই দালান হাসি-প্রুফ। হাসিতে এই বাড়ির কোনো ক্ষতি হয় না। কিন্তু কান্না, বিলাপ, আর্তনাদ এ ভবন ও তার আসবাবপত্র সহ্য করতে পারে কি না, প্রমাণিত নয়। একটু আগে যেমন দাদির চিৎকারে কাচ ভেঙে গেছে।

মা বললেন, 'বল্টু তুই দাঁড়িয়ে আছিস কেন হাঁদার মতো। তোকে যে ঘরে যেতে বললাম।'

মামা বললেন, 'জো-জো-জোয়ান লোকের থাকাটা কি জ-জ-রুরি না!'

মা বললেন, 'বল্টু, তুই যাবি!'

মামা বললেন, 'একা একা যে-যেতে ভয় লাগছে। এতো বড়ো কাণ্ড ঘটে গেলো! চোর ডাকাত না হোক ভূত প্রেত-জি-জি-জিন ...

বুয়া বললেন, 'জিন পরী?'

মামা বললেন, 'হ্যাঁ, পরী! জো-জো-জোয়ান পুরুষ তো। একা একা ভয় লাগে। হালিমা খালা, আপনি সঙ্গে চলেন।'

বাবা আবার হো হো করে এসে উঠলেন। মামার পিঠে চাপড় দিয়ে বললেন, 'সাব্বাস, জোয়ান মরদ। তোকে তো চিড়িয়াখানার বাঘের খাঁচায় চাকরি দিতে হবে রে। তুই রোজ খাঁচায় ঢুকে বাঘগুলোকে নাওয়াবি-খাওয়াবি। কী, পারবি না?'

মামা বললেন, 'য-যাহ রসিকতা করছেন।'

দাদি বললেন, 'সবাই এ ঘর থেকে যাও।'

দাদির কথা সামরিক অধ্যাদেশের মতোই। বাবা-মা মামা হালিমাবুয়া সবাই গ্যালারি-ভাঙা দর্শকের ভঙ্গিমায় ফিরে চলল!

দাদি বললেন, 'বুবু, যা, বাথরুম যা!'

অপি বাথরুমে গেলো। আয়নার সামনে দাঁড়ালো। নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে তার নিজেরই মায়া হচ্ছে। আবারো এক দমকা হাওয়া উথালপাথাল অন্তরে ঝাপ্টা মারলো যেন। যেন মেঘে মেঘে ধাক্কা লেগে আরম্ভ হলো নতুন পশলা বর্ষণ। এতো কান্না, এতো কান্না। তীব্র রোদনধ্বনি ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে ভেতর থেকে। অপি বেসিনের ট্যাপ ছেড়ে দিলো। শব্দ উঠলো জলধারাপতনের। সে হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করলো পানির শুশ্রূষাময় ধারা। পানির শব্দের আড়াল তাকে আশকারা যোগালো, সে ডুকরে শব্দ করে কাঁদতে লাগলো, গা ছেড়ে দিয়ে।

কেঁদে কেঁদে বুকটা খানিক হালকা হলো।

যেমন ভালো একটা বর্ষণের পর আকাশটা ভারহীন হয়ে ওঠে।

তোয়ালে দিয়ে চোখমুখ মুছে আলো নিভিয়ে সে শুয়ে পড়লো নিজের বিছানায়। চাঁদের আলো এখন অনেকটা সরে গেছে, তেরসা হয়ে।

www.shopnil.com

চুপচাপ চারদিক। বহুদূর থেকে ভেসে আসছে রেলগাড়ির বাঁশির আওয়াজ। ইনজিনের ধীর গুমগুম শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার পর চাঁদের পিঠের মতো নিস্তব্ধতা।

অপির ঘুম আসছে না।

দাদি নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছেন, অপি ভাবলো।

এমন সময় শোনা গেলো দাদির গলা, 'বুবু তোর কী হয়েছে?'

অপি চুপটি মেরে পড়ে রইলো ঘুমের ভান করে।

দাদি বললেন, আবার, 'অপি। তুই ঘুমোস নি, আমি জানি। কথা বল। বল তোর কী হয়েছে?'

'কিছু হয় নাই।'

'নিশ্চয় হয়েছে। আমার কাছে লুকোনোর চেষ্টা করার দরকার নাই।'

অপি নীরব হয়েই রইলো।

দাদি বললেন, 'কী হয়েছে, বলবি না?'

'কান্নার দমকে খেই খুঁজে ফিরে অপি বললো, 'বলেছি তো, কিছু হয় নাই দাদি।'

'তোর কি কথা বলতে ইচ্ছা করছে না?'

'উ হুঁ।'

'ঠিক আছে কথা বলতে হবে না। শুধু একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো। তুই হ্যাঁ বা না বলবি। অপি, কাঁদতে কি তোর খুব ভালো লাগছে?'

'হ্যাঁ, দাদি। লাগছে।'

অকূল পাথারে দাদি যেন পেয়ে গেলেন কাঠের টুকরা। বললেন, 'বুবু, তুই কি প্রেমে পড়েছিস? হ্যাঁ বা না বল।'

অপি হ্যাঁ বা না কিছুই বললো না। নিজের বিছানা ছেড়ে এসে শুলো দাদির পাশে। তাকে জড়িয়ে ধরলো হাত বাড়িয়ে।

দাদি বললেন, 'এ-রকমই হয় বুবু। প্রেমে পড়লেই কেবল মানুষ এমন করে কাঁদে।'

অপি দাদির আঁচলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে আশ্রয় খুঁজতে চাইছে। আর অপি যেন একটা ছোট্টো মানুষ, তাকে ঘুম পাড়ানিয়া গান শুনিয়ে ঘুম পাড়াতে হয়, দাদি তার গায়ে ধীরে ধীরে হাতে চাপড়াতে লাগলেন। বললেন, 'ঘুমা বুবু'। খনিক নীরবতার পর দাদির কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগলো, মৌমাছির গুনগুনানির সুরে—

পরানে বাজে বাঁশি, নয়নে বহে ধারা—
দুখের মাধুরীতে করিল দিশাহারা।
সকলই নিবে কেড়ে, দিবে না তবু ছেড়ে—
মন সরে না যেতে, ফেলিলে একি দায়ে॥
কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারই ঘায়ে—
নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে॥

গুনগুন থামিয়ে দাদি অস্ফুটস্বরে বললেন, 'বুড়োটা সব লিখে গেছে, না রে! আমাদের সবার মনের কথা। গোপন কথাগুলোও। মনে হয় জাদু জানতো!'

অপি, ঘুমের ঘোরে, বললো, 'কার কথা বলছো দাদি! দাদার কথা?'

'দুরো!' দাদি গলায় এক ধরনের আহ্লাদি টান এনে বললেন, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা! জাদুকর! মেয়েদের মনের কথা এমন জানতো।'

'মেয়েদের সঙ্গে খুব মিশতো বোধ হয়!' অপি হাই তুলতে তুলতে যুক্ত করলো টীকা।

দাদি মৃদু হাসলেন! মেয়েদের সঙ্গে মিশলেই বুঝি এতো সুন্দর লেখা যায়! তাহলে গাইনির ডাক্তাররা কতো কিছু লিখতো! তিনি ঘুঘুর বুকের মতো নরম কোমল হালকা ভিরু নাতনিটির শালিখের ঠ্যাঙের মতো কণ্ঠায় চুমু খেলেন। গুঞ্জরিত হতে লাগলো—

কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারই ঘায়ে—
নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে॥

শিউলির গন্ধ ভেসে আসছে জানালা দিয়ে, ঘরটা যেন সুবাসসমুদ্রে একটা নৌকা। বাইরে সুবহে সাদিকের নরম আলো, দুধের ফেনার মতো আলো নেমে আসছে স্বর্গ থেকে, আকাশের আঁচল বেয়ে। টুপটুপ করে শিউলি ঝরছে, শিশিরবিন্দু তার আলতো শরীরে এমনভাবে জমছে যেন ফুলের ঘুম ভেঙে না যায়।

অপি ঘুমের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে।

এবং স্বপ্নের ভেতরে ভাসছে।

ভাসছে এক বিশাল অ্যাকুরিয়ামে, বিচিত্র বর্ণ মাছেদের সঙ্গে। তার পানি নীল, বুদ্বুদ শাদা, আর জলগুল্মগুলো এতো সবুজ এতো গাঢ় যেন নীল।

একটা গোল্ডফিশ অপির পিঠে কানকো বুলিয়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। অপির খুব হাসি পাচ্ছে। কিন্তু সে হাসছে না, যদি মুখে পানি ঢুকে যায়।

পিঠের কাছে গোল্ডফিশটা, দেখা যাচ্ছে না, বললো, 'অপি, অপরাজিতা, তুমি হাসতে চাইলে হাসতে পারো।'

অপি হাসলো! ওমা এ কী! বুদ্বুদ, যেন অসংখ্য মুক্তো, তার নাকমুখ থেকে ভুরভুর ভুরভুর করে বেরিয়ে মাতিয়ে তুললো পুরোটা অ্যাকুরিয়াম।

সবগুলো মাছ সেই বুদ্বুদ ধরছে, আর হাসছে, 'হাসি ধরছি, আমরা হাসি ধরছি।'

তার পিঠের সুড়সুড়ি আর হাসির উদ্রেক করছে না। আরাম লাগছে। অনির্বচনীয় অনুভূতিতে তার শরীর এলিয়ে পড়ছে। অপি হাতপা নেড়ে ঘুরে তাকালো গোল্ডফিশের দিকে। মাছ কোথায়! এক সোনালি রঙের যুবক। তার চুল সোনালি, চোখের তারা সোনালি, সমস্তটা হাতপা নখ সোনালি। যুবক তার দিকে অপরাধী চোখে তাকালো। অপির চোখে অনুমোদন এবং মুগ্ধতা। যুবক অপির দু কাঁধে হাত রাখলো। অপি হাত বাড়িয়ে ধরল যুবকের সিংহ-কটিদেশ। যুবক তাকে আকর্ষণ করলো। অপি তার বুকে লেপ্টে গেলো। তার সমস্ত শরীরে কম্পন, যেন আনন্দ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যুতকণা হয়ে শরীরের প্রত্যন্ত প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে। তারা দুজন জলের মধ্যে ভাসছে, ভেসে থাকার জন্যে চারটি পা নিচের দিকে নাড়তে হচ্ছে। যুবক তার নাক ঘসতে লাগলো অপির চোখেমুখে নাকে-ঠোঁটে।

ভোরের স্নেহময় আভা এসে পড়েছে বিছানায়, সেই আলোয় অপির মুখখানা মনে হচ্ছে দুধে ধোওয়া। অপির চোখেমুখে প্রশান্তি, ঠোঁট দুটোয় মৃদু হাসি, তৃপ্তি।

www.shopnil.com

মোছো মোছো আঁখিজল আজি বিদায়বেলা

ঢাকার ওয়ারি এলাকায় পাচিলঘেরা গাছ-গাছড়ায় ঢাকা পুরোনো দোতলা বাড়ি, হাসিবাড়ি। ঢাকায় এখন জমির দাম আক্রা, পুরোনো বাড়িগুলো সব কোটি কোটি টাকায় বিক্রি হচ্ছে, বাড়ি নয়, জমির লোভে কোটিপতিরা কিনছে ওসব। আর পুরোনো বাড়ি ভেঙে ফেলে তোলা হচ্ছে আকাশছোঁয়া অট্টালিকা।

সে জায়গায় হাসিবাড়ি কিছুটা বিসদৃশ তো বটেই। বাবা বলেন, 'আমাদের বাড়ি হলো কংক্রিটের মরুভূমিতে এক সবুজ মরূদ্যান। হা-হা-হা।'

দাদি বলেন, 'ইটের পরে ইট, মাঝে মানুষ কীট, নেই কো ভালোবাসা।'

হালিমা বুয়া বলেন, 'নেই কো ভালোবাসা, খালি ইটাইটি, খিটিমিটি। হি হি হি হি।'

সেই হাসি দেখে অপিও হাসে। অপূর্ব নির্মল প্রাণখোলা হাসি।

অপির দাঁত খুবই সুন্দর। পাতলা গোলাপি ঠোঁটের নিচে দু পাটি শঙ্খশাদা দাঁত। সে যখন হাসে, তার চোখ দুটো চিকিচিক করে ওঠে। হাসিতে মুক্তো ঝরে বলে একটা প্রবাদ আছে। বাবা বলেন, 'বল্টু মিয়া, বলো দেখি, হাসিতে মুক্তো ঝরে প্রবাদটা এলো কোথা থেকে?'

মামা বলেন, 'মুক্তো তেমন দামি জিনিস না। কক্সবাজারে ১০০ টাকায় একডজন পিংক পার্ল পাওয়া যায়। এর বদলে প্রবাদটা হওয়া উচিত, তার হাসিতে হেরোইন ঝরে।'

খুব উঁচুমানের রসিকতা নয়। তবু সবাই হেসে ওঠে। বাবা বলেন, 'আরে গাধা। আমি কী কই আর আমার সারিন্দায় কী কয়। আমি বলি, কী সুন্দর হরিণ। সে বলে, খাবো। আমি বলি, কী চমৎকার হাঁস, বলা উচিত বলাকা! সে বলে খাবো। আমি বলি কী সুন্দর মোরগ, গ্রীবা উঁচিয়ে কেশর ফুলিয়ে হাঁটছে ; সে বলে ভালো রোস্ট হবে। আমি বলি, টেবিলে আমার আপেলগুলো হেসে ওঠে। সে বলে, দ্যাও, খায়া ফালাই। মাথামোটা কোথাকার। হা-হা-হা-হা।'

ঘরের সবাই হেসে ওঠে। অপিও।

বাবা বলেন, 'দেখ, আমার অপরাজিতা মাকে দেখ, ওর দাঁত থেকে কতোগুলো মুক্তো ঝরে পড়ছে, তোর পিংক পার্ল না, গাধা, শাদা মুক্তো। ওর হাসি দেখেই তুলসিকান্ত লাহিড়ি, বিখ্যাত বৈয়াকরণিক এই বাগধারা বানিয়েছিলেন।'

ঘরে হাসির হুল্লোড় ওঠে।

হালিমা বুয়া বাবাকে বলেন, 'ও চাচাজান, সেই জন্যে আমাকে মুক্তার মালা বানায়া দিছেন। মেয়ের হাসির নিচে ডালি ধইরা মুক্তা পাইছেন। বিনা খরচায় আমারে বানায়া দিছেন। হি-হি-হি-হি।'

মামা বলেন, 'হালিমা খালা, আমার অপি মা হাসলে মুক্তা ঝরে, এটা আমি মানি। নিশ্চয়ই মানি। কিন্তু আপনার হাসি থেকে কিন্তু মুক্তা ঝরে না। আপনার যেমন পানখাওয়া পোকায় খাওয়া কালো কুচকুচে দাঁত!'

মা বলেন, 'বল্টু, এ বাসায় কেউ কাউকে আঘাত দিয়ে কথা বলে না।'

হালিমা বুয়া বলেন, 'হি হি হি। অপি মা হাসলে পড়ে মুক্তা, আর আমি হাসলে পড়ে শুকতা। হি হি হি হি।'

ছোটো মামা বলেন, 'অপি, তোর হাসি থেকে মুক্তা না ঝরিয়ে চেষ্টা করে দেখ তো ডায়মন্ড কিংবা প্লাটিনাম ঝরানো যায় কিনা। দেশের উন্নতির কথা তো ভাবতে হবে। হা-হা-হা-হা।'

অপি বলে, 'যাহ, তুমি কী যে বলো না মামা।'

ছোটো মামা বলেন, 'আর হালিমা খালা, আপনিও দেশের জন্যে একটা কিছু করেন। শুকতা না উৎপাদন করে যদি কিছু কয়লা চুনাপাথর ছাড়তেন, দেশের ভালো হতো আর কী! হা-হা-হা।'

এই হলো হাসিবাড়ির চরিত্রগুলোর সাধারণ রূপ।

উপস্থিত এ কজন মানুষ ছাড়াও হাসিবাড়ির আরেক ছেলে আছে। অপির বড়ো ভাই হ্যাপি। সে চলে গেছে অ্যামেরিকায়। হাসিবাড়ির কেউ এভাবে দূরপ্রবাসে চলে গিয়ে বাকি সবার মন খারাপের কারণ হবে, চিন্তাই করা যায় না।

একদিন হ্যাপি এসে বললো, 'বাবা, স্টেটসে নিউঅরলিন্সের একটা ইশকুলে আমার ভর্তি কনফার্ম হয়ে গেছে। নেক্সট সেপ্টেম্বরে ক্লাস শুরু। আমি কি যেতে পারি?'

বাবা বললেন, 'তুই তো কঠিন সওয়াল জিগ্যেস করছিসরে হ্যাপি। যেতে না পারলে কি তোর মন খারাপ হবে।'

হ্যাপি বললো, 'তোমরা কি আমার মন খারাপ করাটা অ্যালাউ করবে?'

বাবা বললেন, 'কদ্যপি নহে।'

'তাহলে তো বাবা মুশকিল হবে।'

'সে জন্যেই তো বলছি কঠিন সওয়াল। তুই যেতে না পারলে মন খারাপ করবি। বঁড়শি থেকে ফসকে যাওয়া মাছটাই সবচেয়ে বড়ো মাছ হয়। চিরদিন ভাববি স্টেটস হলো সুখের খনি। ওখানকার মরুভূমিতে বালির বদলে সোনার গুঁড়া। আমি কী হারাইলাম! এটা তো আমি হতে দিতে পারি না। হাসিবাড়ির কেউ মন খারাপ করে থাকবে, তাহলে তো বাড়ির নাম বদলে রাখতে হবে বিষাদকুটির। হা-হা-হা। অ্যামেরিকায় তুই যাবি। নিশ্চয় যাবি। কেন তোকে ওদেশে যেতে দিচ্ছি, বলতো।'

'কেন বাবা?'

'কারণ তোর মতো এমনি করে আরেকজন লোক স্টেটসে গিয়েছিলেন। চার্লি চাপলিন। অ্যামেরিকায় না গেলে এই হাসির বিষণ্ন রাজাকে দুনিয়া পেতো? একটা শর্তে আমি তোকে পাঠাব, মাত্র একটা শর্তে।'

'কী শর্ত বাবা? আমাকে চার্লি চাপলিনের মতো বাটারফ্লাই গোঁফ রাখতে হবে?'

বাবা হাসলেন। 'আরে, না। তোকে একটিবার ডিজনিল্যান্ডে যেতে হবে। কার্টুনগুলো

www.shopnil.com

চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ভাবতেই ভালো লাগে, মানুষকে আনন্দ দেবার জন্যে এতো আয়োজন। হা-হা-হা।'

হ্যাপি বললো, 'বাবা। আমি নিশ্চয়ই যাবো। আমি তো বাবা ঠিক করেছি অ্যানিমেশন ডিজাইনের ওপরেই পড়াশোনা করব। ভবিষ্যতে আমাকে তো অ্যানিমেশন ফিল্মই বানাতে হবে। ধরো বাবা আমি সুকুমার রায়ের গল্প থেকে কার্টুন বানালাম। অবন ঠাকুরের ক্ষীরের পুতুল বানালাম। কেমন হবে?'

বাবার দু চোখে আনন্দ জল হয়ে চিকচিক করে উঠলো। হ্যাপি বিদেশ যাওয়ার অনুমতি পেলো।

ভাইয়ার বিদায়ের দিনটা অপির আজো মনে আছে।

তাদের বিখ্যাত ভক্সওয়াগনটা বের করা হয়েছে সেদিন, বহুদিন পর। ড্রাইভ করছেন বল্টু মামা। সামনে তার পাশে বসেছেন বাবা। পেছনের সিটে গাদাগাদি করে বসেছে তিন মহিলা, অপি, দাদি আর মা।

হ্যাপি তার বন্ধুদের সঙ্গে চলেছে একটা ভাড়া করা মাইক্রোবাসে, বিরাট বিরাট দুটো স্যুটকেস সমেত।

রাস্তায় কিছুক্ষণ যাওয়ার পরই ভক্সওয়াগনের স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেলো। মামা বললেন, 'দুলাভাই, ভারি মজার ঘটনা। নামুন। ঠেলতে হবে।'

বাবা বললেন, 'শ্যালক মশায়, তুই যে কী চালাস না। এটা আমার বাবার আমলের জিনিস। ওর মতিগতি বুঝবো আমি। বিয়ে করেছিস?'

মামা লজ্জিত মুখে ঘাড় নাড়লেন।

'তা হলে তো তুই গাড়ি আর নারী, এ দুটোর রহস্য ধরতে পারবি না। কোনোদিন কোনো মেয়ের হাত ধরেছিস!'

ছোটো মামা তোতলাতে শুরু করলেন। 'মেয়ে মানে কী? যু-যু-যুবতী?

সবাই হেসে উঠলো। মা ধমকের সুরে বললেন, 'কথাবার্তা অবশ্যই সেন্সর করে বলতে হবে। ধর্ম, নারী ও শালীনতাকে আঘাত করে কিছু বলা যাবে না।'

বাবা বললেন, 'হ্যাঁ মানে কোনো ইয়ং লেডির হাত আর কী! ইংরেজিতে বললে নিশ্চয় সেন্সরে আটকাবে না।'

মামা বললেন, 'ন্ না ধরি নাই।'

'তাহলে তুই গাড়ির স্টিয়ারিং ধরেছিস কোন্ অধিকারে? যা, নাম। আমি দেখছি স্টার্ট নেয় কিনা।'

মামা নামলেন। বাবা বললেন, 'ইয়ং ম্যান, হাত লাগা। দেখি কেমন শক্তি। ঠ্যাল্।'

মামা আর দু চারটে টোকাই যোগাড় করে ফেললেন। ঠেলাপর্ব শুরু হলো। নানা কসরতের পর সদাশয় গাড়ি স্টার্ট নিলো।

মধ্যপথে এসে স্টার্ট আবার বন্ধ হয়ে গেলো। ততোক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। বাবা বললেন, 'বল্টু, তোর ঘাড়ে একটা বড়ো রেসপনসিবিলিটি এসে পড়লো। তুই গাড়িটা পাহারা দে। আমি ছেলেটাকে গুডবাই বলে তোকে উদ্ধার করতে আসছি।'

মামা বললেন, 'আমি এ-এ-এ-কা থাকব।'

বাবা বললেন, 'নিশ্চয়, একা থাকবি। দি সলিটারি রিপার। জোয়ান মরদ।'

'জোয়ান মরদ' শব্দ শুনে মা আবার বাবাকে ইঙ্গিত করলেন সেন্সর মেনে চলতে।

বাবা বললেন, 'স্যরি, আই মিন ইয়ং ম্যান, একা থাকো। এসব পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। দেখবি এভাবেই একদিন প্রেম হয়ে যাবে। বলা তো যায় না কোনো রূপসী মেয়ের গাড়ি ঠিক এই জায়গাটাতেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে।'

লাজরাঙা মামাকে ফেলে রেখে দুটো স্কুটারে উঠে অপিরা পৌঁছুলো এয়ারপোর্টে। দোতলার ডিপার্চার লাউঞ্জে ঢোকার টিকেট মাথাপিছু ৫০ টাকা।

বাবা বললেন, 'আমাদের মধ্যে কেউ রাবণ নেই। তাহলে তার দশমাথার জন্যে ৫০০ টাকার টিকেট করতে হতো।'

মা বাবাকে বললেন, 'হক সাহেব, একটা টিকেট কিন্তু কম কাটতে হবে। আপনার যে মাথা বলতে কিছু নেই, সেটা নিশ্চয়ই এরা বুঝবে।'

আবার হাসির হররা, ছররা বন্দুকের গুলির মতো হাসির টুকরা ছড়িয়ে পড়লো দিকবিদিক।

এয়ারপোর্টের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ডিপার্চার লাউঞ্জে ঢুকলো সবাই। ভেতরে আগেই এসে উপস্থিত হয়েছে হ্যাপি আর তার দুই বন্ধু। তারা চেকইনের ঝামেলা সেরে রেখেছে।

বাবা বললেন, 'হাতে এখনো ঘণ্টাখানেক সময় আছে। এসো আমরা ওই সিঁড়িতে গিয়ে বসি।'

লাউঞ্জের ভেতরে সিঁড়িতে গিয়ে সবাই বসলো। বাবা বললেন, 'অপি, যাও, চিপ্স আর কোল্ড ড্রিংকস কিনে আনো।'

হ্যাপি বলল, 'আমার কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না বাবা।'

বাবা হাসলেন। তার না বোঝার কথা নয় যে ছেলের মনে টেনশন। কিন্তু তিনি চান না ছেলের যাত্রাকালে কোনো কান্নাকাটি হোক। এ কথা অবশ্য কাউকে বলে দেওয়ার দরকার নেই। সবাই জানে, হাসিবাড়ির লোকেরা হাসতে জানে, কাঁদতে জানে না।

বাবা বললেন, 'বল্টুর কথাটা সবাই একবার ভাবো। ভক্সওয়াগনের বনেটে বসে সে আশায় আশায় আছে, কখন কোন্ সুন্দরীর গাড়ি তার ঠিক পাশে এসে বিকল হয়ে পড়বে।'

এ-কথা ভাবতেই সবার মুখে দেখা দিল ঈষৎ হাসির রেখা।

একগাদা চিপস আর ফ্রুটজুস কিনে এনে অপি যোগ দিলো আসরে। বললো, 'কল্পনা করো বাবা, মামার পাশে একটা করে গাড়ি স্লো হচ্ছে, আর মামা দৌড়ে যাচ্ছে, এক্সকিউজ মি স্যার, আপনার গাড়ির স্টার্টও কি বন্ধ হয়ে গেছে।'

দাদি বললেন, 'আর যদি বল্টুর কাছে সত্যি সত্যি কোনো মেয়ে এসে বলে, শুনুন, আপনার কাছে ঘড়ি আছে, ক'টা বাজে বলুন তো, তাহলে বল্টুর কী অবস্থা হবে! চা-চা-চা-চা.....'

আবার সবার মুখে হাসি।

আরে ওই তো বল্টু — মা আঙুল উঁচিয়ে নির্দেশ করলেন বাইরে। দেখা গেলো, বল্টু মামা

www.shopnil.com

লাউঞ্জের বাইরে কাচের দরজা দিয়ে তাকাচ্ছেন। সবাইকে খুঁজছেন। ঠকঠক শব্দ করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছেন। তাকে ভেতরে আনা হলো। বাবা বললেন, 'কী জোয়ান অব আর্ক, গাড়ি স্টার্ট নিলো শেষতক।'

মামা খুব ঘাবড়ে গেছেন। তোতলামির চূড়ান্ত অবস্থা। অতিকষ্টে, নানা বর্ণে হোঁচট খেয়ে তিনি যা বললেন, তার সারসংক্ষেপ হলো— তিনি একা একা গাড়ি পাহারা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ একটা বেবিট্যাক্সি এসে পাশে থামলো। নেমে এলো তিনটা ভয়ালদর্শন লোক। বললো, 'ভাইজান, কোনো সমস্যা!'

মামা বললেন, 'নো সমস্যা। গাড়িটা একটু ঝামেলা করছে। থানায় খবর দেওয়া হয়েছে। পুলিশ আসছে।' মামা পুলিশের কথা বললেন বুদ্ধি খাটিয়ে।

লোকগুলো তখন তিনটা রাম দা বের করে বললো, 'তা হলে তো সময় নাই। তাড়াতাড়ি মালপানি ছাড়েন।'

মামা বললেন, 'আমার কাছে টাকা আছে মোটে পঁয়ত্রিশ। একটা ঘড়ি আছে। দু'শ টাকা মাত্র দাম। (ঘড়ির দাম বলে মামা ভুল করলেন) এসব কি আপনারা নেবেন? ছোটা লোকি হয়ে যাবে না?'

লোকগুলো টাকা নিলো, ঘড়ি নিলো, মামার নানা জায়গা হাতিয়ে দেখলো, তারপর বললো, 'হারামজাদা!'

মামা ভাবলেন, পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে হারামজাদা গালি! যথেষ্ট হয়েছে। এবার নিশ্চয় ছেড়ে দেবে।

লোকগুলো তখন তার পায়ের দিকে তাকালো। আড়াই হাজার টাকা দামের নাইক্ জুতা।

'হারামজাদা, জুতা খোল।'

মামা খুললেন। বললেন, 'আপনাদের এতো কথা শুনলাম, আমার একটা কথা শোনেন। মোজা দুটো খুলতে বলবেন না। প্লিজ। খালি পায়ে ঘরে ফিরলে বেইজ্জত হয়ে যাবো।'

ওরা বোধ হয় প্যান্টটাও খোলাতো। ঠিক তখনই শোনা গেলো সাইরেনের আওয়াজ। একটা হাইওয়ে প্যাট্রল পুলিশের কার এদিকেই আসছে।

মামা বললেন, 'ওই যে, পুলিশ এসে গেছে।'

লোকগুলো স্কুটারে উঠে দিলো চম্পট।

'আমার আর একা থাকার স্-স্-স্ সাহস হলো না। তাই বাসে চ-চ-চ চড়ে চলে এলাম—মামা বললেন। 'বাসের টিকেট করলি কীভাবে? পয়সা পেলি কই?' বাবার জিজ্ঞাসা।

'ছ-ছ ছিল। প্যান্টের এই গোপন ফুটোয় খুচরো কয়েন কিছু রেখে দিয়েছিলাম না। দু-দু-দু দুর্দিনের সঞ্চয়।'

মামার পায়ের দিকে তাকিয়ে সবাই হাসছে। এই হাসির পেছনে একটা গোপন বেদনা আছে। মামাকে ফেলে রেখে আসায় ভেতরে ভেতরে সবার মনে কী যেন একটা খটকা লাগছিল।

এখন সবার মনের মেঘ কেটে গেছে।

সবাই তাই হাসছে প্রাণ খুলে।

হ্যাপি বললো, 'মামা, তুমি চিন্তা করো না, ইউএসএ থেকে সবার আগে আমি তোমার জন্যে একজোড়া দামি জুতা পাঠাব।'

মামা বললেন, 'একজোড়া না, তুই দুই জোড়া পাঠাবি।'

'ওকে', হ্যাপি রাজি। সে তার সাইড ব্যাগ খুললো। বের করলো একজোড়া স্পঞ্জের স্যান্ডেল। বললো, মামা, নাও, আপাতত পরো।

মামা বললেন, 'ট্রাউজারের সঙ্গে স্পঞ্জের স্যান্ডেল তো খুব খারাপ দেখায়। ভারি লজ্জার ব্যাপার হলো। লোকে দেখলে বলবে কী? যাওয়ার আগে দিচ্ছিস যখন, দে, পরি।'

এসব কাণ্ড দেখে কে না হেসে পারে।

মামা একটু পত্রিকা দেখতে গেলেন পত্রিকার দোকানে। এয়ারপোর্ট লাউঞ্জের ভেতরেই। গভীর মনোযোগে পত্রিকা ওল্টাচ্ছেন, হঠাৎ শুনতে পেলেন, 'তুমি বল্টু না?' তাকিয়ে দেখলেন রীনা, তাদের ক্লাসের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটা।

মামা বুদ্ধি খাটাতে গেলেন, বললেন, 'বল্টু কে? আ-আমি জ-জ-জায়নাল।'

রীনা হেসে ফেললেন, বললেন, 'ও বল্টু তুমি কি নিজেকে লুকোতে পারবে। নার্ভাস হলে যে চ-বর্গের অক্ষরে এসে তোতলাতে থাকো, আমি বুঝি জানি না।'

মামা দৌড়ে পত্রিকা স্টল ছেড়ে সিঁড়ির কাছের জমায়েতে শামিল হলেন।

সবাই আবার হেসে উঠলো। 'কী মামা, আবার কী হলো?'

মামা ঘটনার ভয়াবহতা বর্ণনা করলেন।

হ্যাপি বললো, 'মামা। তুমি পালিয়ে এলে কেন?'

'পালাব না। আমার পায়ে স্পঞ্জের স্যান্ডেল। জি-জিন্সের সঙ্গে মোজা পায়ে কেউ চ-চ-চপ্পল পরে।'

'ও মামা', হ্যাপি বলল, 'আপনি গিয়ে বলুন, জুতোজোড়া পালিশ করতে দিয়েছেন। এ স্যান্ডেলজোড়া বুটপালিশঅলার।'

'তাই তো, উপস্থিত বুদ্ধি থাকতে হয়।' মামা চললেন রীনার কাছে।

বললেন, 'রীনা, একটা কথা তোমাকে বলতে এসেছি। বলব। স্যান্ডেল জো-জো জোড়া আমার নয়। পালিশঅলার। জুতা কালি করতে দিয়েছি তো।'

রীনা বিস্মিত। 'তোমার পায়ে স্যান্ডেল নাকি! খেয়াল করিনি তো। তাতে কী হয়েছে? এটা কোনো জানানোর মতো কথা হলো?'

'না, মানে, আমি ভেবেছি, তুমি আমাকে জুতাছাড়া দেখে ফেলেছ, পায়ে স্পঞ্জের স্যান্ডেল, আবার মোজা!'

'তা তোমাকে এই নীল দু ফিতায় শাদা মোজায় মানিয়েছে খুব। হি হি হি হি।' সুন্দরী রীনা পুরো বিমানবন্দর কাঁপিয়ে হাসতে লাগলেন। 'যাক। কোথায় তোমার বুট পালিশঅলা চলো তো। আমার স্যান্ডেলটার নিচে একটা পেরেক ঠুকে নিই।'

মামা বুদ্ধি করে বললেন, 'ভেতরে নয় তো। বাইরে।'

'বাইরে। চলো। বাইরেই চলো। আমি এখানে এসেছিলাম একটা বই কিনবো বলে। সেদিন দেখে রেখে গিয়েছি। আমার কাজ শেষ।'

www.shopnil.com

মামা জ–জ–জ–জ–জ–জ–জ করতে লাগলেন।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে অপি সব দেখছে। মামাকে বাঁচানো দরকার। সে দৌড়ে গিয়ে মামার হাত ধরে টানতে লাগলো, 'মামা, জলদি এস। ভাইয়া ইমিগ্রেশনে ঢুকে গেলো বলে। যাকে বিদায় দিতে এসেছো, তাকে বিদায় দিতে হবে না?'

রীনার কাছ থেকে মামাকে বাঁচিয়ে নিয়ে এলো অপি। তারপর পুরো আসরে বর্ণনা করলো মামার কাণ্ডকারখানা। জমায়েত হো হো করে হাসতে হাসতে ফোলানো বেলুনগুচ্ছের মতো গড়াগড়ি খেতে লাগলো।

এদের হাসি দেখে কজন জাপানি লালসাহেবও হাসতে হাসতে এ ওর ঘাড়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলেন।

হ্যাপি বললো, 'উঠি, হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেলো। সবাই হাসিমুখে বলো, খোদা হাফেজ।'

সবাই হাসিমুখেই বিদায় জানালো হ্যাপিকে। মা তাকে হাসতে হাসতে জড়িয়ে ধরলেন, দাদি হাসিমুখে তার কপালে এঁকে দিলেন চুম্বন। বাবা বললেন, 'যেখানেই যাও, মনে রেখ তুমি হাসিবাড়ির ছেলে।'

অপি বললো, 'ভাইয়া, বি হ্যাপি, তাড়াতাড়ি একবার বেড়াতে আসিস দেশে।'

হ্যাপি বললো, 'তোর বিয়ে ঠিক হলে খবর দিস। বিয়ে খেতে তো আসতেই হবে।'

অপি বললো, 'সারাক্ষণ বিয়ে বিয়ে করো কেন? তোমার বিয়ের সাধ হয়ে থাকলে নিজেই করে ফেল। স্টেটসে গিয়ে মেম–টেম ই ধরে ফেলবে কিনা কে জানে।'

হাসিমুখেই হ্যাপির বিদায় সম্পন্ন হলো। শুধু কী আশ্চর্য, হ্যাপি ভেতরে ঢুকে যাওয়ার পর, ওর দুই বন্ধু বাবুল ও সিনহা টপটপ করে চোখের জল ফেলতে লাগলো। রীতিমতো হাপুস হুপুস কান্না।

হাসিবাড়ির মেয়ে হিসেবে অপির উচিত ছিল ভেঙচি কেটে ওদের কান্নামাখা মুখখানিতে হাসি এঁকে দেওয়া।

অপি তাও করলো না।

'মামা, ওই যে রীনা আন্টি' বলে মামাকে ঘাবড়ে দিয়ে সবাইকে আরেক চোট হাসালো মাত্র।

বলো হাসি, কী রকম চাপ চাপ হেসে উঠেছিল ঐ হাসিগুলি, হাহাকারগুলি

হাসিবাড়ি। আনন্দের উৎসবের অদ্ভুত মজার এক বাড়ি। এ বাড়ির নিয়মই হলো, ২৪ ঘণ্টা এখানে হাসি লেগে থাকতে হবে। এ বাড়ির কেউ কাঁদবে না, সবাই হাসবে। নিজে হাসবে, অন্যের হাসির ব্যবস্থা করবে। কেউ কাউকে আঘাত করবে না, কেউ কারো ক্ষতি করবে না। দাদা বলে গেছেন, যে দুঃখ অনিবার্য, তাকে মেনে নিতেই হবে, তার জন্যে হা–পিত্যেশ করলেও কোনো লাভ নেই, কেঁদে–কেটে কোনো ফল নেই; আর যে–দুঃখ নিবারণ করা যায়, এসো, সবাই মিলে তাকে ঠেকিয়ে দেই।

দাদা কি সত্যি সত্যি এমন সুন্দর করে বলে গেছেন? অপির কাছে একটু প্রশ্নসাপেক্ষই মনে হয় উক্তিটি। কারণ দাদা যে এই বাড়ির নাম রেখে গেছেন হাসিবাড়ি, হাসির নিরবধি চর্চার এক অনিবার্য ঐতিহ্য স্থাপন করে গেছেন, তার পেছনে ছিল তার স্বার্থ।

দাদা বই পড়তে ভালোবাসতেন এবং ছাপার অক্ষরের প্রতিটা কথা বিশ্বাস করতেন। শেষ বয়সে এসে তার মধ্যে নানা বাতিক দেখা দিয়েছিল। একদিন কী এক বইয়ে তিনি পড়লেন, লাফটার ইজ দি বেস্ট মেডিসিন। যে বাড়িতে হাসি আছে, সে বাড়িতে যম ঢুকতে পারে না। সে কারণেই মানুষ কখনো হাসতে হাসতে মরে না, মানুষ মরে কাঁদতে কাঁদতে। যম এমন ব্যথা সৃষ্টি করে, যাতে মানুষটা কাঁদতে বাধ্য হয়, হাসি পরিত্যাগ করে। তখন হাসির প্রহরীদের অনুপস্থিতির সুযোগে যম ঢুকে পড়ে ঘরে, জান কবচ করে নিয়ে যায়। কোনো বাড়িতে যদি ২৪ ঘণ্টা হাসি–আনন্দ বজায় থাকে, সেই বাড়ির মানুষ অমর হবে। অমর যদি নাও হয়, দীর্ঘজীবী হবে। শতায়ুর নিচে কেউ থাকবেই না।

দাদার তখন শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। বয়স হয়েছে, চোখে ভালো করে দেখতে পান না, কানেও কম শোনেন। হাতে–পায়ে বাতের ব্যথা। বুকের ভেতরে কেমন শব্দ হয়, হাহাকারের মতো। তার বন্ধু ডাক্তার শশীভূষণ এলএমএফ বলে দিয়েছেন, কায়সুল, এবার মন শক্ত করো, ভবের মায়া কাটিয়ে ওঠো, তিনি তোমায় ডাকছেন, যে কোনো দিন তাঁর সমীপে যেতে হবে। দাদা বন্ধুর এই নিষ্ঠুর পরামর্শে আতঙ্কিত বোধ করেছিলেন। সারা জীবন কষ্ট করেছেন, শেষ বয়েসে এসে ঢাকায় একটা দোতলা বাড়ি হয়েছে, তিনি গাছগাছালি লাগাচ্ছেন, সে সব বড়ো হচ্ছে, একমাত্র ছেলের ঘর নাতি–নাতনি এসে আলো করে রেখেছে—এই সময় তাঁকে যেতে হবে! সারা জীবন কেবল তিনি বীজ বুনেই গেলেন, ফসল কাটার উৎসবে, নবান্নের আনন্দে তার কোনো বখ্‌রা নেই?

বইয়ের এই সূত্র তাকে অকূল দরিয়ায় আশার সন্ধান দিলো। যেন নূহের জাহাজে পায়রা

www.shopnil.com

ফিরে এল সবুজ জলপাই পাতা ঠোঁটে। তিনি চিৎকার করে উঠলেন, নূরজাহান, নূরজাহান!

দাদি তখন ছিলেন বাথরুমে, গোসল সারছিলেন, দাদার চিৎকারে ভেজা কাপড়ে বেরিয়ে এলেন, দেখলেন দাদা হাসছেন, খিলখিল হাসি। দাদি ভয়ার্তস্বরে বললেন, 'হক সাহেব, কী হয়েছে, আপনি এমন করছেন কেন?'

দাদা বললেন, 'হাসো নূরজাহান, হাসো। লাফটার ইজ দি বেস্ট মেডিসিন।'

রাত্রিবেলা শুয়ে শুয়ে বিছানায় দুই বয়স্থ মানুষ কতো কথা বললেন, কতো পরিকল্পনা আঁটলেন। দাদা বললেন, 'বলো নূরজাহান, পুস্তকে কি মিথ্যা কথা লিখতে পারে? মানুষ জন্মের পর জন্ম ধরে যে জ্ঞান যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, তাই কি বইয়ে লিখে রাখে নি? হাসলে আয়ু বাড়ে— একথা তো সবাই বলে।'

দাদি বললেন, 'হ্যাঁ, আমিও একথা কোথায় পড়েছি বটে। রবিবাবুও বলেছেন, চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, উছলে পড়ে আলো। ও রজনীগন্ধা, তোমার গন্ধসুধা ঢালো। তবে কথা কি জানো, কবিরা তো হয় আলাভোলা মানুষ, তাদের কথা দিয়ে জীবন চলে 'না?'

'কবিদের কথায় জীবন চলে না? বলো কি তুমি?' দাদা আঁতকে উঠলেন। না, আমি বলছিলাম কি আপনার বন্ধু শশীভূষণ এলএমএফকে যদি একবার জিগ্যেস করে নিতেন!'

এই পরামর্শটা দাদার ভালো লাগলো না। শশীভূষণ সেকালের ডাক্তার। ও কি আর মেডিক্যাল বই ছাড়া অন্য কোনো বইয়ের কথা বিশ্বাস করবে।

তবু পরদিন প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে দাদা শশীডাক্তারের কাছে পাড়লেন কথাটা। 'শশী, তুমি কি বলো, হাসলে কি আয়ু বাড়ে?'

'বাড়তে পারে। এই যে প্রবাদ প্রবচন, এসব তো মানুষের জ্ঞানের সঞ্চয়।'

'না। তোমাদের মেডিক্যাল বইয়ে কি এ সম্বন্ধে কিছু লিখেছে?'

'এ তো মুশকিলে ফেললে ভাই। সেই কবে এসব বই ছেড়ে দিয়েছি। এখন তো ধরো চালাচ্ছি ওষুধ কোম্পানির কাগজপত্র পড়ে। তা হ্যাঁ, মনে পড়ছে বটে, রোগীর মন প্রফুল্ল রাখার কথা সব মেডিক্যাল শাস্ত্রেই আছে। বিদেশে তো এ জন্যে হাসপাতালে ফুল রাখা হয়, বই রাখা হয়, গান শোনার ব্যবস্থা আছে, টেলিভিশনও দেখানো হয় রোগীদের।'

'তাহলে মেডিক্যাল শাস্ত্রও ওই কথাই বলছে'— দাদা আপনমনেই বিড়বিড় করলেন।

সে রাতে তিনি এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখলেন। দেখলেন, তিনি মারা গেছেন। তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, নাতি-নাতনিরা তাকে ঘিরে কাঁদছে। তার ইচ্ছে হচ্ছে ছোটো ফুটফুটে নাতনিটার মাথায় হাত রেখে দোয়া করেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি হাত নড়াতে পারছেন না। তারপর তাকে কবর দেওয়ার জন্যে গোরস্থানে নিয়ে যাওয়া হলো। গোরখোদকেরা সুন্দর গর্ত বানিয়েছে। তাকে সেই কবরে নামানো হলো। অমনি চারদিক থেকে পানি এসে কবর ভাসিয়ে দিলো। থই থই অবস্থা। তখন কোত্থেকে ছুটে এলেন নূরজাহান, সদ্যবিধবা খিলখিল করে হাসতে হাসতে বললেন, এ হলো প্রেমের মড়া, এ তো জলে ডুববে না, কিছুতেই না। মৌলবী-মওলানা সব ভয় পেয়ে নানা দোয়া-দুরুদ পড়তে লাগলেন। কিন্তু পরিস্থিতি কিছুতেই তাদের নিয়ন্ত্রণে আসছে না।

দাদার ঘুম ভেঙে গেলো। সমস্ত গা ঘেমে ভেসে যাচ্ছে। বুক কাঁপছে, মৃত্যুভয় তার চোখ মুখে দাগ রেখে গেছে। তিনি তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়লেন। আবার ওই বইটা বের করলেন। স্পষ্ট লেখা— যে বাড়িতে ২৪ ঘণ্টা হাসি লেগে থাকে, সে বাড়িতে মৃত্যু ঢুকতে পারে না।

তিনি তার কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। বাসায় ২৪ ঘণ্টা হাসির শব্দ বাজতে থাকবে, খিলখিল, হা হা হি হি। তখন দাদাদের এলাকায় ভাড়ায় কাঁদুনে পাওয়া যেতো। পয়সা দিলে লোকে এসে বাসায় কান্নাকাটি করে দিতো! বড়লোকদের বাড়িতে কেউ মারা গেলে আত্মীয়-স্বজনদের আর কষ্ট করে কাঁদতে হতো না। তাদের বদলে কাঁদুনেরা কাঁদতে বসতো। দাদা বললেন, পয়সা দিলে যদি লোকে কাঁদতে পারে, তাহলে পয়সা দিলে লোকে হাসতে পারবে না কেন?

তিনি সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠালেন কাঁদুনে পাড়ায়। কাঁদুনেরা এলো। তিনি তার ফরমায়েশ জানালেন। ভাড়া দেব দ্বিগুণ, কাঁদার বদলে হাসতে হবে। ৮ ঘণ্টা করে ডিউটি। তিনজন পালা করে ২৪ ঘণ্টা উচ্চস্বরে হাসবে। কোনো বিরাম দেওয়া চলবে না।

কাঁদুনেরা বললো, 'সে কী কথা মশায়। কান্না হলো আমাদের বাপ ঠাকুরদার পেশা। ঠাকুরদা এই পেশা দিয়ে গেছেন বাবা-কাকাকে, বাবা-কাকার কাছ থেকে পেয়েছি আমরা। পৈত্রিক পেশা বদলাতে নাই। তাতে অকল্যাণ হয়। এ জনমে আমরা কাঁদি বলেই তো পরের জীবনে শুধু হাসব। আর এখন যদি হাসি, পরের জনমে শুধুই কাঁদতে হবে। হাসির পরে কান্না, বলে গেছেন রামশর্মা।'

দাদা বললেন, 'যাও তোমাদের ভাড়া বাড়িয়ে তিনগুণ করা হলো।'

কাঁদুনেরা ভেবে দেখলো, দিনকাল ভালো না, পেশার অবস্থা খারাপ, ব্যবসাপাতি মন্দা যাচ্ছে, আজকাল আর কেউ পয়সা দিয়ে কাঁদুনে ভাড়া করতে চায় না, ছোটোলোকের মতো নিজেরাই কাঁদতে বসে। তার চেয়ে বরং এই খ্যাপটাই মারা ভালো। তারা হাসতে রাজি হলো।

তিনজন হাসুনে পালা করে হাসবে— এই হলো চুক্তি। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেলো, ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদা যতো সহজ, খিলখিলিয়ে হাসা ততো সহজ নয়। কাঁদতে দম ক্ষয় কম, কিন্তু হাসতে স্টামিনা লাগে। তুমি হা হা হো হো করে হাসি শুরু করতে পারো, কিন্তু কতোক্ষণ চালিয়ে যেতে পারবে, পনেরো মিনিট, আধঘণ্টা, তারপর? তারপর গলা শুকিয়ে আসে, বারবার জল খেয়েও আর শব্দ বেরোয় না। হাসুনেরা বললো, 'হাস্য করা বড়ো কঠিন মশায়। আট ঘণ্টা লাগাতার হাসা কি সহজ কথা। তাছাড়া হাসির জন্যে কারণ লাগে, অকারণে কেউ হাসতে পারে?'

দাদা বললেন, 'তাহলে তোমরা কাঁদো কেমন করে? কাঁদতে তোমাদের অজুহাত লাগে না? কাঁদুনেরা বললো, 'আজ্ঞে, কাঁদার উপলক্ষ কি চারদিকে কিছু কম? দু বেলা দু মুঠো খেতে পারি না, ছেলেটার অসুখ, বৌটা মরছে বিনা চিকিৎসায়, বাবা-কাকারা সব পরজন্মে হাসছেন নাকি কাঁদছেন, এসব কিছু একটা চিন্তা করলে কান্না আপনা আপনি বেরিয়ে আসে। তাছাড়া পেটে ভাত থাকলে না মন খুলে হাসা যায়। আধাপেটা লোকের পক্ষে কি হাসা সম্ভব নাকি সঙ্গত?'

দাদা বললেন, 'ঠিক আছে, আমি তোমাদের দুবেলা পোলাও-কোর্মা দই খাওয়াব। পেটপুরে খাবে, দিল ভরে হাসবে।'

www.shopnil.com

বেশ পোলাও-কোর্মা চললো বাড়িতে। কিন্তু এতো করেও হাসুনেদের মন পাওয়া গেলো না। একদিন সকালবেলা দেখা গেলো, খাঁচা শূন্য, পাখি পগাড় পার। হাসুনে তিনজন নিকাল দিয়েছে।

দাদা বললেন, 'পারিব না এ কথাটি বলিও না আর, একবার না পারিলে দেখ শতবার। কাঁদুনেরা গেছে তো কী হয়েছে! মানুষের প্রয়োজনে পেশার সৃষ্টি হয়েছে, পেশার প্রয়োজনে মানুষ নয়। আমি হাসির ইশকুল দেব।'

বাড়ির নিচতলার দুটো রুম খালি করা হলো। এক রুমে বিছিয়ে দেওয়া হলো শতরঞ্জি। ব্লাকবোর্ড লাগানো হলো। পাশের ঘরটা বরাদ্দ হলো পণ্ডিতের জন্যে। বহু খোঁজাখুঁজির পর একজন যথোপযুক্ত পণ্ডিতকে পাওয়া গেলো। তুলসিকান্তি লাহিড়ি। তিনি বললেন, অতি সহজপাঠ, আমিই পারবো শিক্ষার্থীদের হাস্য শিক্ষা দিতে।'

পণ্ডিতকে নিয়োগপত্র দেওয়া হলো। মাসোহারা তিনশ টাকা। ভোজন ও শয়ন ফ্রি। শিক্ষার্থীদের জন্য জলপানি মাসিক দশ টাকা। বাড়ির সামনে সাইন বোর্ড লাগানো—এখানে হাস্য শিক্ষা দেওয়া হয়।

পণ্ডিত বললেন, 'প্রতিটি বৃক্ষের শাখাকাণ্ডপত্র আমরা দেখি, মূল আমরা দেখি না। কিন্তু মূলবিহীন বৃক্ষ কি বাঁচে?

জ্ঞানবৃক্ষের মূল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা থাকা বিধেয়। শুধু দন্ত বিকশিত করে হাস্য করলেই চলবে না, কেননা তাতে হাসি স্থায়ী নাও হতে পারে। অতএব আমি প্রথমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের ভিত্তি পোক্ত করতে চাই।'

দাদা বললেন, 'তাই করুন।'

পণ্ডিতমশাই পাঠদান শুরু করলেন। প্রথমে সংজ্ঞা। 'হাস্য কাহাকে বলে? তোমরা কি অবগত আছো?'

মাদুরে বসা সাতটি কোমল কণ্ঠ উচ্চারণ করলো, 'না, পণ্ডিতমশায়।'

'তাহলে মন দিয়ে শোনো' —পণ্ডিতমশায় বলে চলেছেন, 'আবেগ ও বুদ্ধি পরস্পরে অসমান গতিসম্পন্ন হওয়ার দরুন পরিস্থিতি বিশেষে মানুষের আবেগ ও বুদ্ধির মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংশ্লেষণ হয় এবং অন্তে দুই বিপরীতের সম্মিলনে, উষ্ণবায়ু ও শীতল বায়ুর সংমিশ্রণের মতো, যে ফলটি ফলে— তাহাই হাস্য। ইহাতে ওষ্ঠ ও অধর বিক্ষিপ্ত হয়, দন্ত বিকশিত হয় এবং বিচিত্র অব্যয়ধ্বনি সরবে বা নীরবে উচ্চারিত হয়।'

পণ্ডিতমশায় বারতিনেক এই সংজ্ঞা মুখে বললেন। অতঃপর চকখড়ি দিয়ে কৃষ্ণফলকে (ব্লাকবোর্ড) তা লিপিবদ্ধ করলেন।

পেছন ফিরে দেখলেন, তার শিষ্যসকল কেউ নিদ্রিত, কেউবা বিপরীতমুখে উপবিষ্ট, কেউ আবার পাশেরজনের সঙ্গে কান মলামলিতে রত।

তিনি গর্জে উঠলেন, 'ওহে শাখামৃগ সকল, কর্ণপটাহ কর্ণমূল থেকে উৎপাটন করে দিব। হেই হাঁদা, তুই বল, হাস্য কাহাকে বলে?'

হাঁদা নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো।

গ্যাদা দাঁড়িয়ে বললো, 'পণ্ডিতমশায়, আমি বরং উদাহরণ দেই।' সে ফিক করে হেসে ফেললো।

পণ্ডিতমশায় বললেন, 'হয়েছে, উপবেশন কর।'

এমনি করেই চললো পণ্ডিতমশায়ের হাস্য-অধ্যয়ন চক্র।

একদিন জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা শাখা ঘেঁটে তিনি হাসির বুৎপত্তি লিখে আনলেন। শিক্ষার্থীদের পড়ে শোনালেন : 'আড্রিনাল গ্লান্ড নামক একটি গ্রন্থি হইতে আড্রিনালিন নামক রস নিঃসৃত হইয়া প্রাচীনকালে মনুষ্যগণকে কঠিন দৈহিক পরিশ্রমের উত্তেজনা যোগাইত। কালক্রমে দৈহিক শ্রমের প্রয়োজনীয়তা কমিয়া যাওয়ায় এই গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত রস একটি নূতন শারীরিক প্রতিক্রিয়া ঘটায়—ইহা হইল হাস্য।'

তিনি এই কঠিন বুৎপত্তি মুখস্থ করানোর জন্যে ছাত্রদের কঠিনতর অনুশীলনে ব্রতী করলেন। এক ছাত্র অন্য ছাত্রের কান ধরে থাকে। যার কান, সে ব্লাকবোর্ড দেখে বুৎপত্তি পড়ে শোনায়। যার হাত সে শোনে। তারপর হাত ও কান বদল ঘটে। এভাবে দিনের পর দিন একই বাক্য পড়তে পড়তে ও শুনতে শুনতে শিক্ষার্থীদের মুখস্থ হয়ে যায়।

এরপর তিনি আসেন রসের শ্রেণীবিভাগে। অলঙ্কারশাস্ত্র ঢুঁড়ে তিনি শিক্ষার্থীদের জানান : রস নয় প্রকার, যথা : শৃঙ্গার বা আদি, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, শান্তি ও বৎসল। বৈষ্ণব সাধনে রস পাঁচ প্রকার : শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর।

'কী বুঝলি?' তিনি ছাত্রদের জিজ্ঞেস করলেন।

ছাত্ররা সবাই নিজ নিজ স্লেটে কাটাকুটি খেলছিল। পণ্ডিতমশায় বলেন, 'ওরে লম্বু, বল তো দেখি রস কতো প্রকার।'

লম্বামতো পড়ুয়া উঠে দাঁড়ালো। বললো, 'আজ্ঞে, অনেক প্রকার। যথা : তালের রস, আখের রস, খেজুরের রস, রসমালাই, রসগোল্লার সিরা।' পণ্ডিতমশাই বেত বের করলেন— 'এবার দেখবি বীভৎস রস। হেঁ হেঁ হেঁ।'

পণ্ডিতমশায়ের পাঠশালা পাস করে যারা বেরুলো, প্রাকটিক্যালি হাসার ক্ষেত্রে তাদের পারফরমেন্স হলো ভয়াবহ। দেখা গেলো তারা বাস্তবে হাসতে গেছে ভুলে, হাসির নানা তত্ত্বীয় দিক, সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ইত্যাদি নিয়েই তারা গভীরভাবে চিন্তিত ও ভারক্লিষ্ট। কোনো হাসির ঘটনা ঘটলে তারা তাকাতো পরস্পরের মুখের দিকে। একজন আরেকজন জিজ্ঞেস করতো, এই হাঁদা, এই গ্যাদা, এটা হাসির কোন্ বিভাগভুক্ত হবে রে? কোন হাসিটা হাসব? কাষ্ঠহাস্য নাকি মিষ্ট হাস্য। এটা করুণ রস নাকি বীর রস?

পাঠশালা প্রকল্পের ফল দেখে দাদা খুবই হতাশ হয়ে পড়লেন। এবার তিনি এক ইংরেজ সাহেবকে নিয়োগ দিলেন হাসির ইশকুল চালানোর জন্যে।

ইংরেজ হলো প্রাকটিক্যাল জাতি। হাসানোর জন্যে সংজ্ঞাচর্চা না করে তিনি গ্রহণ করলেন প্রাকটিক্যাল পদ্ধতি।

তিনি বললেন, 'আমাকে একটা কেমিকাল ল্যাবরেটরি স্থাপন করতে হবে।' নানা টেস্টটিউব, বকযন্ত্র, ছিপি, গ্যাসসিলিন্ডার এলো। রাসায়নিক দ্রব্যাদি এলো। তিনি উৎপাদন করলেন নাইট্রাস অক্সাইড। লাফিং গ্যাস।

ক্লাসরুমে হাইবেঞ্চ লোবেঞ্চ বসল। ছাত্ররা সব ইউনিফর্ম পরে সুন্দর হয়ে এলো ক্লাসে। সাহেব ক্লাসে ছাত্রদের বসিয়ে ডেকে পাঠালেন দাদাকে। তারপর ক্লাসে ছেড়ে দিলেন লাফিং

www.shopnil.com

গ্যাস। সব ছাত্র হি হি খিলখিল করে হাসতে লাগলো। শিক্ষক নিজে হাসছেন। পরিদর্শনে এসে দাদাও হাসতে লাগলেন হো হো করে।

রাসায়নিক পদ্ধতি ছাড়াও তিনি প্রয়োগ করলেন কতোগুলো ফিজিক্যাল মেথড। এর মধ্যে আছে সুড়সুড়ি পদ্ধতি। ক্লাসরুমে মানবদেহের বড়ো ছবি। সেই ছবিতে চিহ্নিত করা হলো মানুষের হাস্যপ্রক্রিয়ার স্নায়ুকেন্দ্রগুলো। কোথায় কোথায় সুড়সুড়ি দিলে মানুষ হাসে, ছাত্রেরা তা রপ্ত করলো শতকরা ১০০ ভাগ নির্ভুলতার সঙ্গে।

সাহেবের ইশকুল থেকে পাস করা ছাত্ররা হাসিবাড়িতে চাকরি পেয়ে গেলো। দাদার খুশি দেখে কে? সারাক্ষণ ছাত্ররা এ ওর গায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে, আর হেসে গড়িয়ে পড়ছে। কতো বিচিত্র শব্দেই না তারা হাসছে। হা হা হো হো হি হি হু হু, উ উ খুক খুক, খিল খিল ফিক ফিক ফি ই ই। হাসির শব্দে বাড়ি গমগম, পরিবেশ সরগরম। দাদার মন ভালো হয়ে গেলো। আজরাইল যে বাড়ির চৌহদ্দিতে পা রাখতে পারছে না, তিনি নিশ্চিত। এই নিশ্চিতি থেকে তার স্বাস্থ্য ভালো হতে শুরু করলো। চেহারায় দেখা গেলো উজ্জ্বলতা। কাঁচা লেবুর গায় যেমন ঢল ঢল করে লাবণ্য ও সজীবতা তেমনি। দাদা বললেন, 'দেখলি, হাসিতে কাজ হয়। আমার বাইসেপ দেখ। দুদিনেই কেমন চেকনাই দেখা দিয়েছে। আজ বুঝতে পারছি, সত্যি, লাফটার ইজ দি বেস্ট মেডিসিন। ওরে তোরা সবাই হাস।'

ইংরেজ সাহেব বড়ো অংকের বখশিশ নিয়ে বিদায় হলেন। আর তাঁর ছাত্রদের চাহিদা মেটাতে গিয়ে দাদা গ্রামের জমিজমা বেচতে লাগলেন। জমিজমাই ছিল দাদার একমাত্র আয়-রোজগারের পথ। কিন্তু তিনি সে সব বিক্রি করতে লাগলেন অকৃপণ ভঙ্গিতে। বললেন 'না না, হাসি বন্ধ করা যাবে না। যম নিয়মিত বাড়ির চারদিকে ঘুরঘুর করছে।'

কিন্তু এই হাসুনেরা মাত্র তিনমাস টিকতে পারলো। শরীরের ওপর দিয়ে তাদের বড়ো ধকল যাচ্ছিল। রাসায়নিক গ্যাসের কারণে হাসা, শরীরে আর কতো সয়! তার ওপর আছে সুড়সুড়ি, কাতুকুতুর প্রতিক্রিয়া। সারা শরীরে ব্যথা। এসব নিয়ে কতো আর পারা যায়? কদিন আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাসা যায়। 'চাকরি চাই না বাবা, জিরোতে চাই, বেঁচে থাকতে চাই'— তারা সবাই একযোগে পালালো।

দাদা আতঙ্কবোধ করলেন। বাসায় হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে না। এই বুঝি যম ঢুকে পড়লো ঘরে।

দুশ্চিন্তায় আর আতঙ্কে দাদা কাহিল হয়ে পড়লেন। শয্যা নিলেন। খুব বড়ো ব্যামো তার শরীরে এসে বাসা গাড়লো। দাদা বললেন, 'ওরে, এভাবে হেরে যাবো। বিনাযুদ্ধে নাহি দেব সুচ্যগ্র মেদিনী। ওরে, তোরা সবাই হাসতে থাক। ভাড়াটে হাসুনের চেয়ে নিজেরা হাসা ভালো। তাহলে যম ভয় পাবে। ভাববে, এতো হাসিখুশি একটা বাড়িতে ঢুকলে আমি নিজেই দমবন্ধ হয়ে মারা পড়ব!'

দাদার অসুখটা ছিল সত্যি গুরুতর। শশীভূষণ ডাক্তার বললেন, 'ওর যা যা খেতে ইচ্ছে করে ওকে খাওয়াও। ওর ইচ্ছে-অনিচ্ছে তোমরা যথাসাধ্য পূরণ করো।'

বাবা বুঝতে পারলেন অবস্থা ভয়ঙ্কর।

দাদা বলেই চলেছেন, 'ওরে তোরা হাস। ওরে তোরা হাসতে থাক।'

অপির বয়স তখন তিন বছর। হ্যাপির পাঁচ। দুই ফুপু তখনও এ বাড়িতেই। হালিমা বুয়ার বয়স চল্লিশের কোঠায়। বাবা-মা-ফুফুরা তাকে হালিমা খালা বলেই ডাকে। একমাত্র দাদি বলেন বুয়া। সবার মধ্যে এক আশ্চর্য বাতিক দেখা দিলো, হাসতে হবে। সবার মনে এ বিশ্বাসও দেখা দিলো— হাসলে সত্যি সত্যি দাদাকে বাঁচানো যাবে। সবাই হাসছে, কারণে-অকারণে। এ ওর গায়ে ধাক্কা খেয়ে ব্যথায় কঁকিয়ে না উঠে হাসছে, একজন হাঁচি দিলে অন্যজন তাই দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ছে।

দাদি হাসছেন, রবিঠাকুরের হাস্যকৌতুকগুলো মনে করে করে, পিঠে বানিয়ে হ্যাপির হাতে তুলে দিয়ে পিঠে বসিয়ে দিচ্ছেন কিল, বলছেন, 'পেটে খেলে পিঠে সয়, কিন্তু পিঠে খেলে পেটে সয় না। দেখিস, আবার বাথরুমে যেন বিছানা পাততে না হয়।' কথা শেষ হওয়ার আগেই তিনি হেসে উঠছেন খলবল করে। পিঠে কিল খেয়ে, রবিঠাকুরের উক্তি শুনে, হ্যাপি কী বুঝলো, সেই জানে, সেও হেসে উঠলো হা-হা-হা করে।

বাবার বিখ্যাত ও অতিচর্চিত হো হো হাসিটাও তখনই বাবা রপ্ত করে ফেললেন। কথায় কথায় হাসেন। আজ তরকারিতে বড়ো বেশি নুন দিয়েছ গো— হো হো হো।

সেই সব দিন অপির আজো মনে পড়ে। বাড়ির সবাই ঘিরে ধরে আছে দাদার রোগশয্যা। সবার মুখেই হাসি। দাদার বুকে প্রচণ্ড ব্যথা। তবু দাদা হাসছেন। তিনি একে একে তাকালেন তার পরিজনদের মুখের দিকে। একমাত্র ছেলে মাজহারুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স, চাকরি করছে একটা বীমা কোম্পানিতে, হাসছে। হো হো করে হাসছে। তার চোখেমুখে সত্যিকারের প্রশান্তি। এ বিরূপ পৃথিবীটার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে সে সত্য সত্য প্রস্তুত। এই হাসি বীরের হাসি। তাঁর পুত্রবধূ। এই মেয়েটির সব কিছুই চাঁদের আলোয় যেন মোড়ানো। যেন তার শাড়ির আঁচল হাসছে, ঘোমটা হাসছে। হাতের চুড়িগুলো হাসছে। তার চোখের মণি দুটো হাসছে। তার দুই মেয়ে শিউলি ও টগর— কেমন পরস্পরকে কনুই দিয়ে গুঁতো দিচ্ছে আর হাসছে। আর নাতি হ্যাপি। সার্থকনামা। সারাক্ষণই সুখী ও পরিতৃপ্ত ভাব। সামনের দুটো দাঁত পড়ে গেছে, ফোকলা মুখে ওর হাসি যেন স্বর্গ থেকে আসা। কেমন শরীর কাঁপিয়ে হাসে। বিচিত্র শব্দ হয়। তার নাতনি অপি। অপরাজিতা হক। নাহ্। এ জীবনে সে পরাজিত হবে না। অপরাজিতা ফুলের মতোই দশদিক আলোকিত করে রেখেছে। ও চোখ তুলে তাকানো মানেই তো চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙে দেওয়া।

আর তার স্ত্রী। কী আলোকিত এক মানবী। সারাক্ষণ মেতে আছেন রবীন্দ্রনাথ নিয়ে। কোনোদিন তাকে কাঁদতে দেখেন নি তিনি। এখন কেমন হাসি হাসি মুখ করে তাকিয়ে আছে।

বাড়ির সবাই তখন হাসছে। প্রাণপণে। আজরাইলকে কিছুতেই এ বাড়িতে ঢুকতে দেবে না তারা। শব্দ হচ্ছে খিলখিল, হি হি, হো হো। দাদা প্রত্যেকের হাসির শব্দ আলাদা আলাদা করে টের পেতে চাইলেন। হাসির অর্কেস্ট্রা থেকে প্রতিটি বাদন আলাদা করা সত্যি মুশকিল। যেন চিনিতে সুজিতে মাখামাখি। তিনি চোখ বন্ধ করে প্রত্যেকের হাসির শব্দ আলাদা করে শনাক্ত করে চলেছেন।

এমন সময় ঢুকলেন হালিমা। বললেন, 'গরম গরম খান। ভাইজা লইয়া আইছি।'

'কী ভেজে এনেছো বুয়া'— দাদি বললেন,

www.shopnil.com

'হাসিভাজা হাসিভাজা'— গরম গরম পিঁয়াজু নামিয়ে হালিমা বললেন। তার মুখে কৌতুকের হাসি। তার রসিকতা হাসির অগ্নিতে ঘি ঢেলে দিল। যেন হাসির বিস্ফোরণ ঘটে গেলো ঘরে।

দাদা চোখ খুললেন। মুখে তার অনাবিল প্রশান্তির হাসি, বললেন, 'আমি প্রস্তুত। আমি মরতে প্রস্তুত। এ বাড়ির সবার মুখে হাসি ফুটেছে। এ বাড়ির সবাই হাসতে শিখেছে। আমার বাড়ির সামনে বাগান, বাগানে ফুল হাসে, পাতায় পাতায় আলো হাসে, পাখিরা হাসে, বাড়ির ভেতরে প্রতিটি মানুষ হাসিখুশি। হ্যাপিনেস কনজিস্টস ইন কনটেন্টমেন্ট। আলগিনা গিনান নাফস। আত্মার অভাবমুক্তিই প্রকৃত অভাবমুক্তি। আমি দেখতে পাচ্ছি, এ বাড়ির প্রতিটি লোক জীবনকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে শিখেছে, মৃত্যুকেও। আমি এখন যমদূতকে তাড়াতে চাই না। মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে চাই না। যদি মৃত্যু আসতে চায় তো আসুক। এই মৃত্যু হবে আনন্দের মৃত্যু। শান্তির মৃত্যু।'

দাদার শরীর চূড়ান্ত খারাপ হয়ে পড়লো। শশীভূষণ ডাক্তার তার নাড়ি দেখে বাবাকে জানিয়ে দিলেন 'সময় শেষ', তেল ফুরিয়ে গেছে।' তেলছাড়া শুধু সলতে আর কতোক্ষণ জ্বলবে। এই বুঝি যায়, ওই বুঝি যায় অবস্থা।

কোত্থেকে খবর পেয়ে তুলসি লাহিড়ির শিক্ষার্থীরা এলো, পেশাদার কাঁদুনেরা এলো, এলো সাহেবের রসায়ন-অভিজ্ঞ ছাত্রেরা—তারা শেষ দেখা দেখতে চায় দাদাকে। পরিবারের প্রতিটি মানুষ উপস্থিত। হাসি নিয়ে দাদার নানা উদ্যোগের কারিগরেরা উপস্থিত। সবাইকে দেখে দাদার মুখে কী যে স্বর্গীয় প্রশান্ত হাসির ঝিলিক।

দাদা বললেন, 'তোমরা সবাই হাসো, না, আমার মৃত্যুকে পিছিয়ে দেওয়ার জন্যে নয়, আমার মৃত্যুকে স্বাগত জানানোর জন্যে। কান্না দিয়ে নয়, হাসি দিয়ে মৃত্যুকে বরণ করা হচ্ছে— এ দৃশ্য পৃথিবীর কেউ কি কোথাও দেখেছে।'

সবাই হাসছে। প্রাণপণ করে হাসছে। এবার দাদা বিশ্বাস করছেন হাসি দিয়ে মৃত্যুকে ঠেকানো যায় না। কিন্তু বাকি সবাই ভাবছে, যেতেও তো পারে। এমন তো হতে পারে হাসির ধমকে যম ফিরে যেতে পারে দুয়ার থেকে।

কিছুতেই কিছু হলো না। ভোরবেলা গাছে গাছে পাখি ডাকছে, বিচিত্র গাছ থেকে উদ্গত বিচিত্র গন্ধের মিষ্টি মিশেল বাতাসে মৌ মৌ করছে, ভোরের পবিত্র আলোয় পৃথিবীকে মনে হচ্ছে সদ্যস্নাতা শাদাশাড়ি রমণীর মতো— দাদা মারা গেলেন।

হাসুনেরা হেসেই চললো।

দাদাকে সমাহিত করা হলো আজিমপুর গোরস্থানে।

হাসুনেরা সবাই, সে পণ্ডিতের শিষ্যই হোক, আর সাহেবের ছাত্রই হোক, বললো, 'আমরা এ বাড়িতেই থেকে যেতে চাই। মরহুম কায়সুল হক সাহেব এক অদ্ভুত ক্ষমতাবান লোক। আমরা সবাই তার মমতার জালে বাঁধা পড়েগেছি।'

ততোদিনে গ্রামের জমিজমা সব বিক্রি হয়ে গেছে। পুরো পরিবার চলছে কেবল বাবার

বাঁধা মাইনের টাকায়। অতিরিক্ত লোক পোষা আর সম্ভব নয়।

বাবা বললেন, 'হাসুনে ভাইরা তোমরা আমার মরহুম পিতার জন্যে যা করেছো তার জন্যে আমি চিরকৃতজ্ঞ। তোমাদের ঋণ শোধ হওয়ার নয়। কিন্তু একটা বাস্তব কথা আমি তোমাদের বলতে চাই। তোমাদেরকে কাজ দেওয়ার মতো আর্থিক অবস্থা আর আমাদের নাই। আমাদের এ বাড়ির গেটে আমি পাথর দিয়ে লিখে রাখব— হাসিবাড়ি। এ বাড়ির হাসির ঐতিহ্য থাকবে। কিন্তু আমাদের হাসির কাজ আমাদের নিজেদেরই করতে হবে।'

হাসুনেরা চলে গেলো।

সমস্ত বাড়ি ফাঁকা ফাঁকা।

তিন বছরের অপি। একটাই ফ্রক পরে আছে তিন দিন হলো। সে খেয়েছে কিনা গোসল করেছে কিনা কেই বা খেয়াল করবে মৃতের বাড়িতে।

পাঁচ বছরের হ্যাপি। তার একটু বুদ্ধিসুদ্ধি হয়েছে। সে তার বোনকে খুঁজে পাচ্ছে না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেলো অপি দাঁড়িয়ে আছে পেছনের ব্যালকনিতে।

হ্যাপি বললো, 'অপি, এখানে একা দাঁড়িয়ে আছিস কেন?'

অপি বললো, 'ভাইয়া, যারা মরে যায়, তারা কোথায় যায়?'

হ্যাপি বললো, 'আকাশের তারা হয়ে যায়। একজন মানুষ মরলে আকাশে একটা নতুন তারা ওঠে।'

অপি বললো, 'দাদা কোন্ তারাটা?'

হ্যাপি বললো, 'আকাশে অনেক তারা। এর মধ্যে নতুন তারা খুঁজে পাবো কেমন করে?'

অপি বললো, 'মনে হয় ওই বড়ো তারাটাই দাদা।'

'হতে পারে', হ্যাপি বললো, 'কে জানে, হয়তো তোর কথাই ঠিক। তুই তো ছোটো। ছোটোরা সব কিছু জানতে পারে। ফেরেশতারা শিখিয়ে দেয়।'

দু ভাইবোন হাত নেড়ে নেড়ে বলে উঠলো,

টুইংকল টুইংকল লিট্‌ল স্টার
হাউ আই ওয়ান্ডার হোয়াট ইউআর
আপ এবাভ দি ওয়ার্ল্ড সো হাই
লাইক এ ডায়মন্ড ইন দি স্কাই।

হাসুনেরা চলে গেছে। বাসাটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। সেই নিঃস্তব্ধ বাড়িতে ওই ছড়াটার প্রতিটি শব্দকণা দেওয়ালে দেওয়ালে মার্বেলের মতো গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

দাদার মৃত্যুর পর হাসিবাড়ি কিছুটা হতোদ্যম হয়ে পড়েছিল বটে! বিষয়টা বাবা খেয়াল করলেন। ডাকলেন সবাইকে। বললেন, 'তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে তোমরা বেশ মনমরা হয়ে পড়েছ। ব্যাপারটা ঠিক নয়। এই বাসার কেউ কখনো মন খারাপ করে নাকি! হাসুনেরা চলে গেছে, তাতে কী হয়েছে! বাবা মৃত্যুর আগে কী বলে গেছেন? তিনি শান্তি পাচ্ছেন সবার মুখের হাসি দেখে। পরলোকেও তিনি শান্তিতে থাকবেন, যদি আমরা হাসির চর্চা চালিয়ে যাই। হ্যাপি বাবু, তুমি ওই ছড়াটাই পড়ে শোনাও—

www.shopnil.com

হ্যাপি বললো, 'কোন ছড়াটা বাবা?'

বাবা বললেন, 'ওই যে, হাসতে নাকি জানে না কেউ ...' হ্যাপি উঠে দাঁড়ালো। 'আমার নাম হ্যাপি। আমি একটা ছড়া বলব .....

হাসতে নাকি জানে না কেউ
কে বলেছে ভাই?
এই শোন না, কতো হাসির
খবর বলে যাই।
খোকন হাসে ফোকলা দাঁতে
চাঁদ হাসে তার সাথে সাথে ....

এই পর্যন্ত বলার সঙ্গে সঙ্গে বাবা বলে উঠলো, 'তোর যে ফোকলা দাঁত, এটা ছড়াকার জানলেন কী করে?' সবাই হেসে উঠলো খিলখিলিয়ে।

হ্যাপি বলল, 'আরে আরে, আগে আমার ছড়াটা শেষ করতে দাও।'

এত হাসি দেখেও যারা
গোমড়া মুখে চায়
তাদের দেখে পেঁচার মুখেও
কেবল হাসি পায়।

দিন চলে যায়, দিন থেমে থাকে না। অপি বড়ো হতে থাকে, হ্যাপি বড়ো হতে থাকে। ফুপুদের বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু হাসিবাড়ির হাসির চর্চা অব্যাহত থাকে। তাদের বাড়িতে হাসির বইয়ের ছড়াছড়ি। পরশুরামই বলো, আর শিবরামই বলো— সবার হাতে হাতে ঘুরছে। দাদির অবশ্য প্রিয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তার হাস্যকৌতুক ব্যঙ্গকৌতুক আর ছড়াগুলো আর হাসির কবিতাগুলো। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যাসেট এরা বড়ো ভালোবেসে শোনে। দেখে থ্রি স্টুজেস, চার্লি চাপলিনের মতো সিনেমাগুলো। এ বাড়িতে যারা বেড়াতে আসেন তারাও যেমন হাসতে জানেন, তেমনি জানান হাসাতে।

আমি ভালোবেসে এই বুঝেছি সুখের সার সে চোখের জলে

শুক্রবার। বাবার অফিস বন্ধ। সকালবেলা নাশতার টেবিলে বাবা প্রসঙ্গটা তুললেন। দাদি আর মাও বসেছেন সঙ্গে। ছুটির দিন বলে আজ সকালেই খিচুড়ি রাঁধা হয়েছে। মামা আর অপি এখনো বিছানায়। সকাল ৮টা বেজে গেছে, এরা আরো কতোক্ষণ ঘুমুবে কে জানে। মেয়ে সারারাত ঘুমোয়নি, কান্নাকাটি করেছে। হাসিবাড়ির মেয়ে মাঝরাতে দাদির কোলে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে— ঘটনা কী? বাবার মনে গুরুতর প্রশ্ন। এবং কৌতূহল। শুধু কি ঘটনা এই যে, মেয়ে অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে দাদির গায়ে পড়েছে। মেয়ের বয়স বিশ পেরিয়ে একুশে পড়ছে, এই বয়সের মেয়ের চোখে পানি, ব্যাপারটায় একটা কিন্তু রয়ে গেছে!

খিচুড়ির প্লেট থেকে ধোঁয়া উঠছে। হালিমা বুয়া ডিম ভেজে এনে টেবিলে রাখলেন। বললেন, 'ছোটো আপায় উঠলে গরম গরম খাইতে পারতেন। আইজকা তার দুইটা ডিম খাওন দরকার।'

'কেন, দুটো ডিম খেতে হবে কেন?' মা বললেন।

'কাইলকা রাইতে উনি যতো ফোঁটা চোখের পানি ফেলছেন, তাতে তাঁর তিন প্যাকেট খাবার স্যালাইন তিন জগ পানিতে গুলায়া খাওন উচিত।'

পুরো টেবিল হো হো করে উঠলো।

মা বললেন, 'তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু দুটো ডিম কেন?'

'ওমা, অন্যান্য স্বাভাবিক খাওন দিতে হইবো না? ডাবল ডাবল দিতে হইবো। কী তাজ্জব কাণ্ড। এই বাড়ির মেয়ে কান্দে?'

বাবা বললেন, 'কই, অপি মামণিকে ডাকো। ওর কী সমস্যা, আমরা শুনি। সবাই মিলে ওকে সাহায্য করি।'

দাদি বললেন, 'ওর আবার সমস্যা কী? রাতের বেলা অন্ধকারে আছাড় খেয়েছে। এই তো।'

বাবা বললেন, 'শুধু এই কারণে কেউ এমন করে কাঁদতে পারে?'

দাদি বললেন, 'এই কারণে তো কাঁদেনি। কেঁদেছে আমার চিৎকারে। এমন চিৎকার, কাচ ফেটে চৌচির।'

তখন সবার মুখে হাসি দেখা দিলো।

বাবা বললেন, 'চৌচির না তো মা। শতচির। হো হো হো।'

অপি বিছানা ছাড়লো দশটার দিকে। এতো বেলা করে সে কখনো ওঠে না। কাল রাতের ঘটনা মনে পড়ায় তার লজ্জা হলো। সে দাদিকে বললো, 'কী লজ্জার কথা। দশটা বেজে গেছে। দাদি তুমি আমাকে ডাকবে না? আমার পাশ থেকে চোরের মতো কখন উঠে গেছো।'

দাদি বললেন, 'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না, বেলা হলো মরি লাজে। আ মরণ।

www.shopnil.com

তুমি কোথায় কোন অজায়গায় মন রেখে এসেছো তার দায় আমাকে নিতে হবে। ওঠো। বাড়িতে মিটিং বসেছে। জরুরি তলবি সভা। বিষয় : অপরাজিতা হক ওরফে অপির চোখের জলের কারণ অনুসন্ধান ও তাকে সহযোগিতা প্রদান। আপাতত চিকিৎসা : ডাবল ডিমের ওমলেট ও তিন প্যাকেট খাবার স্যালাইন।'

'বলো কী দাদি?'

'যাও। সবাই ঘটনা জানার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমাণ।'

'দাদি। তুমি কি সব বলে দিয়েছো?

'না। আমি কী বলবো? সবাই বোঝে। এ জীবনে ও অভিজ্ঞতা একবার দু'বার প্রত্যেকেরই হয়েছে।'

'দাদি। আমি কিন্তু এখন সত্যি সত্যি কাঁদতে বসব।'

'সত্যি সত্যি কান্না মানে! রাতে কি তুই অভিনয় করেছিলি?'

'দাদি প্লিজ কাউকে কিছু বল না। আর ওইসব মিটিং ফিটিং থেকে আমাকে বাঁচাও।' অপি তাঁর দাদিকে জড়িয়ে ধরলো।

দাদি বললেন, 'আমাকে কী দিবি ঠিক কর। তোকে বাঁচিয়ে দিয়েছি। বলে দিয়েছি আমার চিৎকারই সব কান্নাকাটির মূল। আর কোথাও কোনো সমস্যা নাই। শুনে সবাই বেশ মজাই পেয়েছে। যাহ বেঁচে গেলি আপাতত।'

'ও দাদি, তুমি এতো ভালো কেন?'

'তোর বয়স তো একদিন আমারও ছিল! এখন তুই চাইবি আড়াল। একটা নিজের ঘর, নিজস্ব কোণ। নিজের একটা আকাশ। তোর নিজের ভাবনার এই জগতে অন্য যে কেউ অবাঞ্ছিত।

তোর একটা আলাদা ঘর থাকলে কতো ভালো হতো। কিন্তু নিচের তালাটা ভাড়া দিতে হয়েছে। সত্যি তো, তোর ঘরে আমি যদি না থাকতাম এতো বড়ো কাণ্ড ঘটতোই না। যাক তোর কান্না তোকেই কাঁদতে হবে। অন্য কেউ সেই ভার লাঘব করতে পারবে না। এ কান্না কাঁদতেও সুখ। আমি কাউকে কিছু বলব না বুবু। এটা তোর নিজের ব্যাপার। তুই যদি বলতে চাস বলবি। যাকে যাকে বলতে চাস তাকে তাকে বলবি। আমাদের বাড়িটা তো ভারি মজার বাড়ি। এ বাড়ির সবাই তোর ভালোর জন্য জান দিয়ে দেবে। তবে কিছু কিছু ব্যাপার তো সভা করে ফয়সালা করা যাবে না। ও আমি বুঝি।'

অপি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তার দাদির দিকে। আশ্চর্য এই মহিলা! এতো কিছু বোঝেন! এতো কিছু ভাবেন! কী সুন্দর করে সব কিছু গুছিয়ে বলছেন! কী সহৃদয়তা দিয়ে সবকিছু উপলব্ধি করছেন! অপির চোখে জল এসে গেলো আবার। কান্না গোপন করতে সে বাথরুমে ঢুকে গেলো, তাড়াতাড়ি।

দাদি ঠিকই বলেছেন, প্রেমে পড়া তরুণীর চাই একটা নিজস্ব ঘর, যেখানে থাকবে সে আলাদা, একা; তার ভাবনার পুরোটা জগত নিয়ে। বাথরুমে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, আবার অঝোর প্লাবনে ভাসতে ভাসতে অপির মনে হলো।

আয়নায় নিজের চেহারার দিকে হঠাৎই তার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হলো। এ কি চেহারা হয়েছে তার। চোখ কোটরাগত, চোখের নিচে কালো দাগ, যেন বয়স বেড়ে হয়েছে ষাট বছর।

কণ্ঠার নিচে হাড় বেরিয়ে আছে, কে বলবে, এ হলো সৌন্দর্য-অস্থি, বিউটি বোন। বরং হাড় দুটো বেরিয়ে আছে পোড়ো জমিনে পড়ে থাকা গরুর চোয়ালের মতো। 'কেউ বলবে, তোমায় দেখে চোখ ফেরানো যায় না?' বিজ্ঞাপনের স্লোগান বেরিয়ে এলো তার ঠোঁট থেকে।

নাহ্। ফ্রেশ হওয়া দরকার। চাই একটা গোসল। দীর্ঘ গোসল। সে বাথরুমের শাওয়ার ছেড়ে দিলো। রিমঝিমিয়ে নামছে পানির ধারা, ধুয়ে দিচ্ছে তার চোখের জল; তার ভালো লাগছে।

সে নিজেকে বললো, অপি, যোগ্য হও। ভালোবাসার জন্যে যোগ্য হয়ে ওঠো।

ভিজতে ভিজতে তার খেয়াল হলো, সে বাথরুমে ঢুকে পড়েছে বিনাপ্রস্তুতিতে, কাপড়-চোপড় আনা হয়নি, এমনকি তোয়ালেও নয়। এখন বাথরুম থেকে বেরুবে কী করে? দরজা সামান্য ফাঁক করে মাথা বের করে সে ডাকলো, দাদি, দাদি,.....।

দাদি ঘরেই ছিলেন 'কী হলো বুবু?'

অপি তার সমস্যাটা বর্ণনা করলো, চাহিদা পেশ করলো, সংক্ষেপে, গলা সামান্য চড়িয়ে, ইঙ্গিতে।

দাদি কাপড়-চোপড় তোয়ালে খুঁজে পেতে এনে বললেন, 'কী, সবকিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, কাজের সিরিয়াল ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে!'

অপি কিছু বললো না, অসহায় ভঙ্গিতে দরজার ফাঁক দিয়ে তাকালো শুধু।

দাদি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তার মুখে রহস্যময় হাসি। কাপড়গুলো নাতনির হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন, 'পিঠ ডলে দিতে ঢুকবো নাকি! সোনার অঙ্গ কালো হয়ে যাচ্ছে যে!'

সকালবেলা খিচুড়ি কে খাবে, এই অজুহাত দেখিয়ে অপি নাশতা ছুঁলো না। চা খেলো এককাপ, তাতে যে চিনি দেওয়া হয় নি, খেয়ালই হলো না তার। মিষ্টি হয় নি, এটা যদি সে ধরতেও পারতো, হয় তো তার মনে হতো, এখন সব কিছু এমনি বিস্বাদই তো লাগার কথা। দুপুরে ভাত খাওয়ার সময় দাদি লক্ষ্য করলেন যে, অপি খুবই অন্যমনস্ক, ভাত নাড়ছে, কিন্তু খাচ্ছে না। খাবার টেবিলে, অন্য সবার সামনে তিনি আর নাতনিকে কিছু বললেন না।

দুপুরে খাওয়ার পর খানিক গড়িয়ে নেওয়া দাদির অভ্যাস। পাশে রবীন্দ্র রচনাবলীর একটা দুটো খণ্ড, দাদি শুয়ে পড়লেন। চোখ লেগে এসেছিল। কান্নার শব্দে তিনি জেগে উঠলেন।

দেখলেন, নিজের বিছানায় অপি উপুড় হয়ে কাঁদছে। তার পিঠ উঠছে নামছে। রীতিমতো হাউমাউ করে কান্না। বিনবিনিয়ে শব্দ হচ্ছে।

স্তব্ধ দুপুর। বাইরে ঝলমলে রোদ। নিচতলার বাগানে কী একটা পাখি থেমে থেমে ডেকে উঠছে। এ শহরে কি ঘুঘু আছে? একটাও? দাদির স্মৃতিবিস্মৃতির পর্দাজুড়ে ভেসে ওঠে এক দূর মফস্বল এলাকার সুপুরিগাছ, লাল লাল ঝোপবাঁধা সুপুরি, চৈত্রের বাতাসে হঠাৎ ঝরে পড়া সুপুরির খোলসমেত পাতা, সেই খোল কুড়িয়ে নিতে একপাল খালি গা বাচ্চার দৌড়, পাতার খোলে এক বালককে বসিয়ে আরেক বালকের টেনে নিয়ে যাওয়া, সব কিছু ছেয়ে ঘুঘুর ঘু ঘু ঘু ঘু একটানা মন্দ্রডাক।

কাঁদুক, নাতনিটা মন ভরে প্রাণভরে কাঁদতে থাকুক।

www.shopnil.com

আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে
বসন্তের বাতাসটুকুর মতো।

ফারুক আব্দুল্লাহকে অপি প্রথম যেদিন দেখেছিল, সেদিন থেকেই তার মনে সে আঁকা হয়ে যায়। যেভাবে দেখাটা হয়েছিল, তা খুব মনে রাখার মতো বিশেষ ঘটনা— তা কিন্তু নয়। অপি তখন সবে আইএসসি পাস করেছে, রেজাল্ট বেরিয়েছে, আহামরি তেমন কোনো রেজাল্ট নয়, ফার্স্ট ডিভিশন আছে, এই যা। ওই বয়সের একটা মেয়েকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কী পড়বে এরপর, সে সহজেই উত্তর দিতে পারে— আর্কিটেকচারে। অপিও তাই দিতো। বুয়েটের আর্কিটেকচারের ৫০টি সিট যেন ঢাকার আধুনিক স্মার্ট তরুণ-তরুণীদের স্বপ্ন। আর্কিটেকচারে ভর্তিচ্ছুদের জন্য একটা ব্যবস্থা আছে। সিনিয়র ছাত্রেরা ডিপার্টমেন্ট ভবনেই তাদের জন্য কোচিং ক্লাস নিয়ে থাকে। অপি সেদিন তার ক্লাসমেট শানুকে নিয়ে প্রথম গেছে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি চত্বরে। বল্টুমামা তার জন্যে একটা স্থাপত্য ভর্তি গাইড 'চত্বর' কিনে এনেছিলেন আগেই। কোচিং ক্লাসে তার ভর্তির সব কিছুও ঠিকঠাক করে রেখেছিলেন। সেদিন বিকাল ৪টায় ছিল কোচিংয়ের পয়লা ক্লাস। রিকশাঅলা তাকে নামিয়ে দিল বুয়েটে শহীদ মিনারের সামনে। আর্কিটেকচার ভবনটা কোন্‌দিকে হতে পারে।' অপি-শানুর কোনো ধারণা ছিল না। শহীদ মিনারের সামনে এক তরুণ রাস্তার ধারের চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছেন। ছেলেটার মাথাভর্তি উশখো খুশকো চুল, পরনে একেবারেই রঙচটা জিন্‌স। গায়ে একটা হালকা শার্ট (জিন্‌সেরই বোধ হয়) হাতা গোটানো। অপি তাকে জিগ্যেস করলো, আর্কিটেকচার বিল্ডিংটা কোন্‌দিকে।

লোকটা, মেয়ে দুটোর মুখের দিকে না তাকিয়ে, বাঁ হাত উঁচিয়ে বললো, সোজা যান, তারপর বাঁয়ে তাকান, ওটাই।

থ্যাংক ইউ বলে তাড়াতাড়ি রাস্তা পেরিয়ে ওদিকে ছুটলো ওরা দুজন। খানিকপরে, জিনসপরা রুখোচুল তরুণটি, একটা রেসিং সাইকেলে মাথা নিচু করে, তাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেলো।

আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্টের বারান্দায় গিয়ে আর কাউকে কোনো প্রশ্ন করতে হলো না। কারণ অংকনবিদ ছাত্রেরা ভর্তিচ্ছুদের কোচিং ক্লাসের পথ চিনিয়ে দিতে প্রচুর পরিমাণে তীরচিহ্ন এঁকে রেখেছে।

কোচিং ক্লাসের প্রথম অধিবেশনটা ছিল আর্কিটেকচার বিল্ডিংয়ের দোতলার একটা ঘরে। অপি ও শানু দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলো, ক্লাসরুমের দরজায় দাঁড়ালো, বলল, 'মে আই কাম ইন স্যার'।

জবাব এলো, এখানে স্যার বলে কোনো পদার্থ নেই। অপি ক্লাসরুমের ভেতরে তাকালো, বেঞ্চে সব যথাসময়ে উপস্থিত ছেলেমেয়ে উপবিষ্ট, আর যিনি ক্লাস নিচ্ছেন তাদের বিপরীতে দাঁড়িয়ে, তিনি আর কেউ নন, সেই রুখোচুল জিন্‌সপরা তরুণ। সাইকেল চালিয়ে আগে এসে দাঁড়িয়ে গেছেন।

'স্যার নয়, ভাই, এসো। ভেতরে এসো। আমি তোমাদের দুজনের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম'— তিনি বললেন।

'স্বাগতম, প্রথমে পরিচয়পর্ব, আগে নিজের পরিচয় দেই, আমি হলাম, ফারুক আবদুল্লাহ'— ক্লাসের দিকে তাকিয়ে এই তার প্রথম বাক্য।

এরপর কোচিং চলল একমাস, সপ্তাহে তিনদিন করে ক্লাস। ছোটোবেলা থেকেই ড্রয়িঙে এপি ভালোই ছিল, স্থাপত্যভর্তির এই অনুশিলনী ক্লাসগুলো সে, বলা যায়, উপভোগই করতো। শুধু ফারুক আব্দুল্লাহই যে ক্লাস নিতেন, তা নয়, আরো অনেক সিনিয়র ছাত্রই নিতেন। এরা সবাই আর্কিটেকচারের থার্ড ইয়ারের ছাত্রছাত্রী। কোচিং ক্লাস ও গাইড বই থেকে অর্জিত টাকায় যাবেন শিক্ষাসফরে। এদের মধ্যে দুজন উঠতি টিভি তারকাও ছিলেন, একজন করতেন টিভিতে একটা কুইজ-প্রোগ্রামের উপস্থাপনা, আরেকজন ছিলেন। নৃত্যশিল্পী, ছায়ানটে নাচ শেখেন এবং টিভিপর্দা জুড়ে প্রায়ই নাচেন।

নতুন জায়গা, অচেনা পরিবেশ, ছেলেমেয়েরা এক জায়গায় একত্রিত, গমগম করছে সব কিছু। ভিকারুন নিসা স্কুল থেকে বেরুনো অপির চোখের সামনে তখন মুগ্ধ হওয়ার, বিস্মিত হওয়ার, দ্বিধান্বিত হওয়ার, ঠেকে যাওয়ার, হোঁচট খাওয়ার এতো কিছু ঘটে যাচ্ছে যে— ফারুক আবদুল্লাহকে তার আলাদা করে চিনে রাখার দরকার পড়ে নি।

শুধু একদিন, থিয়োরিটিকাল ক্লাসে, কী এক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি পড়েছিলেন...একটা কবিতা, জীবনানন্দ দাশের—

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদো না কো উড়ে উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে!
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে!
পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে;
আবার তাহারে কেন ডেকে আনো, কে হায় হৃদয় খুঁড়ে
বেদনা জাগাতে ভালোবাসে!

স্মৃতি থেকে মুখস্থ বলছিলেন তিনি, শ্যামলা মতো লম্বা একটা লোক, মাথায় একরাশ রুখো চুল, তখন ছিল শীতকাল, বিকেল বাইরে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, ভেতরে টিউবলাইটের গায়ে কতোগুলো নিরীহ পোকা ওড়াওড়ি করছে, সেই ক্লাসরুমটাকে মনে হচ্ছে অপার্থিব এক জগত, মনে হচ্ছে মহাকাশে মহাশূন্যতায় ভাসা এক জাহাজ, আর লোকটার চোখ যেন এই কালে নেই, এই ঘরে নেই, কোনো এক নদীতীরে বিষণ্ন চিলের কান্নার নিচে জল ছলছল একজোড়া চোখের খোঁজে ঢুঁড়ে মরছে— নদী বয়ে যাচ্ছে— নদীর জলপ্রবাহের শব্দ হচ্ছে ঝিরঝির ঝিরঝির।

www.shopnil.com

দৃশ্যটা হয়তো অপির মনেও থাকতো না, যদি না একটা ফাজিল ছেলে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করতো, 'স্যার, বেতফল কি খায়?'

ফারুক আব্দুল্লাহর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন একজন সিনিয়র ভাই, প্রগলভ, বলা উচিত সপ্রতিভ, বললেন, কর্মফল হিসেবে ক্লাসে বেত খাওয়াকে বেতফল বলে! সংজ্ঞা পর্যন্তই থাক, উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে গেলে আবার বেত আনাতে হয়।'

শেষ ক্লাসের দিনও ফারুক ছিলেন, সব ছেলেমেয়েই সিনিয়র ভাইদের নাম ঠিকানা লিখে নিচ্ছিল। অপি তার ছবি আঁকার খাতার শেষ পৃষ্ঠা বের করে এগিয়ে দিল ফারুক আব্দুল্লাহর সামনে, বললো— 'একটা অটোগ্রাফ দিন না ফারুক ভাই।' ফারুক বেশ লজ্জিত হলেন মনে হলো।

মাথা নামিয়ে পেন্সিল দিয়ে লিখলেন—

'কাঠবিড়ালির চারা লাফায় উঠানে
জানো তার মানে।'

তার নিচে স্বাক্ষর করে দিলেন।

'এর মানে কী?' অপি তার চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো।

'শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পদ্য —অন্যদিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক কণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন।

তারপর কোচিং ক্লাস শেষ হয়ে গেলো। ভর্তি পরীক্ষা দিলো অপি। চান্স পাওয়া হয় নি, বলাই বাহুল্য। এখন সে পড়ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে। সোশলজি নিয়ে।

এই সব। আর কিছু নয়। এর চেয়ে আর বেশি কিছু নয়।

এই ঘটনার তিন কি চার বছর পর। একদিন। সেই একদিন। বিকেলে টিএসটির মুক্তমঞ্চে ধানসিড়ি নামের এক সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠান। এ ধরনের অনুষ্ঠান প্রায় প্রতিদিনই টিএসসি এলাকায় লেগেই থাকে, অপির এসব অনুষ্ঠানে যাওয়া হয় না বললেই চলে। কিন্তু ধানসিড়ির অনুষ্ঠানটাতে যেতে হলো। তার ক্লাসমেট সাব্বির বলে রেখেছে, এই অপি, তুই তো যাবিই, আরো অন্তত পাঁচজন মেয়ে সঙ্গে নিয়ে যাবি। অপি বলেছিল, 'আরো পাঁচটা মেয়ে আমি পাবো কোথায়?'

'মেয়ে না পেলে ছেলে আনিস। তবে একটা মেয়ে ইকুয়াল টু দুইটা ছেলে। তাহলে তুই যাবি, সাথে দশটা ছেলে।'

'যাহ্। দশটা ছেলে আমি পাবো কোথায়? এক ছিল হারাধন। কিন্তু তার ছেলেরা তো সব হারিয়ে গেছে।'

'আরে বিচ্ছু। তোকে কি ছেলে পয়দা করে আনতে বললাম নাকি! বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এই সব আর কী!'

'না ভাই। দশটা ছেলেও জুটবে না, আমার যাওয়াও হবে না।'

'বাদ দে বাদ দে। তুই একাই একশো। তুই একাই আসিস। সেই ভালো। অনুষ্ঠান শেষ হতে রাত হয়ে যাবে। একা একা ফিরতে পারবি না। আমিই তখন এক রিকশায় ওঠার চান্স নেবো।'

'যাহ্, তোর সঙ্গে কে রিকশায় উঠবে?'

'আরে শুধু আমার পারফরমেন্স দেখ। আবৃত্তি শোন। শুনলে পাগল হয়ে যাবি।'

'পাগল হয়ে যাবো?'

'সিওর। আর জানিসই তো পাগলে কি না করে। তখন তুই আমরা সঙ্গে রিকশায় উঠবি। চাই কি এমন পাগল হয়ে যাবি, একেবারে চুমা-পাগল।'

'চুমা-পাগল না। স্যান্ডেল-পাগল। পা থেকে স্যান্ডেল খুলে তোর মতো কৌটা মার্কা বেঢপ ছেলেদের গালে ব্যাটিং প্রাকটিস করবো।'

'ওরে বাবা। সেটা খুব লাভজনক হবে না। বরং তুই একাই ফিরিস। তবে ফ্রেন্ড প্লিজ যাস। যা অবস্থা, একই সময়ে আরেকটা অনুষ্ঠান আর্ট কলেজে। ওদেরটায় ব্যান্ড-ফ্যান্ড আসবে। আমাদের প্রোগ্রামে কাকও আসবে কিনা সন্দেহ।'

এমন করে বললে না এসে পারা যায় না। অপি গিয়েছিল টিএসসির অনুষ্ঠানে।

টিএসটির মুক্তমঞ্চে কখনো শ্রোতার অভাব হয় না। পাশে স্নাক্সের দোকান ডাস, লোকজন ভিড় করে এটা ওটা কিনে খায়। দু-দুটো মেয়েদের হল, ছেলে-মেয়েরা ভিজিটররা দেখা-সাক্ষাৎ করার জন্য এই জায়গাটাতেই দুদণ্ড বসে। আর টিএসসি ভবন জোড়া নানা সাংস্কৃতিক সংগঠনের মহড়া, প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী কতো কিছু ছেলেমেয়েদের টেনে আনে এখানে। কাজেই ধানসিড়ির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানের মাইক বেজে হ্যালো মাইক্রোফোন টেস্টিং ওয়ান টু থ্রি বলার আগে থেকেই মনে হচ্ছিল অনুষ্ঠানে জনসমাগম ভালোই হয়েছে।

অপি বসেছিলো মুক্তমঞ্চের সামনের সবুজ চত্বরের এককোণে। ক্লাসের আরো দুতিনটা ছেলেমেয়ের সঙ্গে। একটা টোকাই এসে 'আপা, চা খান' 'আপা, চা খান' বলে ঘ্যান ঘ্যান করতে লাগলো। সবুজ, ওদের ক্লাসের ফার্স্ট বয়, বললো টোকাইটাকে, 'চা খাওয়া যাবে। তার আগে বল, 'তোর নাম কী?'

'সুরুজ।'

'সুরুজ? তুমি সেই বিখ্যাত সরুজ।' সবুজের সম্বোধন তুই থেকে তুমিতে উত্তীর্ণ হয়েছে।

সুরুজ মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। মানে আমিই তিনি, বিখ্যাত সুরুজ।

'চেনো তোমরা একে'। বন্ধুদের বললো সবুজ। এ হলো বিখ্যাত স্টার। টিভিঅ্যাডে মডেল হয়েছে। রোগ-বালাইতো আছে দুনিয়ায়। ভালো থাকার আছে যে উপায়। ওকে নিয়ে একটা শর্টফিল্মও হচ্ছে। সিনেমার নামই ওর নামে—'সুরুজ মিয়া।'

'বলো কী?' অপি অভিভূত।

'যাও। সুরুজ মিয়া কাপ ধুয়ে সবার জন্য চা আনো।'

সুরুজ চা আনতে গেলো। অপি বললো,'এতো বড়ো স্টারকে দিয়ে চা আনানো উচিত হচ্ছে?'

চা এলে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে নব্বির বললো, ইস, আমার কাপে চিনি দিতে মনে হয় ভুলে গেছে। সুরুজ মিয়া, যাও এক চামচ চিনি আনো। না থাক। তুমি তো স্টার মানুষ। এতো কষ্ট করবে? অপি। তোর আঙুলটা একটু আমার চায়ে ডুবিয়ে দে'তো। একচামচ পরিমাণ দিবি।'

www.shopnil.com

এ-ধরনের স্তাবকতা পেয়ে অপির অভ্যাস আছে। সে খিলখিল কর হেসে উঠলো। বললো, 'আমি যদি সম্রাট আকবরের মতো কেউ হই, তোকে আমার নবরত্নসভায় চান্স দেবো নব্বির। তুই হবি আমার বীরবল। অফিসিয়াল ভাঁড়। হি হি হি হি।'

অপি চায়ে একটা চুমুক দিলো। দুধ-চিনি বেশি দেওয়া জঘন্য চা। হঠাৎ তার চোখ পড়লো মঞ্চের দিকে। ওখানে পাঞ্জাবি পরা সাব্বিরের পাশে ওটা কে? ফারুক আব্দুল্লাহ না? মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল নেই, পরনে জিন্সের প্যান্ট অবশ্য আছে, কিন্তু গায়ে একটা চমৎকার অফহোয়াইট শার্ট। ইন করে পরা। লোকটা ফারুক আব্দুল্লাহই তো। একজনের আড়ালে পড়ে গেছেন তিনি, ভালো করে তাকে দেখার জন্যে একটু সরতে গিয়ে হাতের চায়ের কাপ পিরিচে কাত হয়ে পড়লো। ছলাক করে চা লাগলো অপির শাড়িতে।

অপি সচরাচর শাড়ি পরে না, ক্লাসে শাড়ি পরে আসার মানেই হয় না, আজ একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলে সে কী মনে করে পরেছে শাড়িটা, অফহোয়াইট জমিন, চওড়া কমলা পাড়,আঁচলে কমলা রঙের বড়ো বড়ো কল্‌কে। সামান্য সবুজের ছোঁয়াও আছে, টাঙ্গাইল সুতির শাড়ি, বেইলি রোডের দোকান থেকে ৭০০ টাকায় কেনা। কপালে সে পরেছে বড়ো একটা কমলা টিপ, দু কানে দুটো দুল, নাকে একটা ছোট্ট নাকফুল, খোপা করেছে, খোপায় ফুল পরেনি ইচ্ছা করে, কারণ ফুল পরলে অনুষ্ঠানের শিল্পীদের ফুলসাজের জোয়ারে সে ভেসে যেতো।

এতো প্রিয় শাড়িটাতেই চায়ের দাগ লাগলো, কিন্তু অপির এদিকে খেয়াল নেই। লোকটা ফারুক আব্দুল্লাহই যে সে নিশ্চিত। তার বুকের ভেতর দুন্দুভি বাজছে।

'ওই, কারে দেখিস হিন্দি সিনেমার নায়িকার মতো, এক লাড়কি কো দেখা তো অ্যায়সা লাগা?' নব্বিরের টিপ্পনি তার কানে গেলো না।

ফর্সা, পাতলা, কাঠালচাঁপার একটা ছিন্ন পাপড়ির মতো পাতলা মুখটা তার লাল হয়ে উঠলো। কানের কাছটা ঈষৎ গরম। কেন এমন হচ্ছে?

সে উঠে পড়লো, চললো মঞ্চের দিকে।

তাঁর চোখে চোখ পড়ল, তিনি চোখ ফিরিয়ে নিলেন না, বরং তাকিয়ে রইলেন, মনে হচ্ছে মুগ্ধ চোখে।

অপি হাসার চেষ্টা করলো। মুখে হাসি ঠিক ফুটলো না।

ফারুক ভাবলো, হয়তো সাব্বিরকে দেখে মেয়েটা হাসছে। শিউলি ফুলের মতো শাদা-কমলা মেয়েটা!

সাব্বির বললো, 'কীরে অপি এসে গেছিস। ভেরি গুড। যাহ বসে পড়। ভীষণ ব্যস্ততা যাচ্ছে। একটু পরে তোদেরকে একবার দেখা দিয়ে আসবো।'

অপি বললো ফারুককে, 'আপনি ফারুক আব্দুল্লাহ না?'

সাব্বির বললো, 'আয় আয় পরিচয় করিয়ে দিই। এ হলো আমার বন্ধু অপি। আর ইনি হলেন আবৃত্তি শিল্পী ফারুক আব্দুল্লাহ। ওই যে 'তুই কি আমার দুঃখ হবি' ক্যাসেটটার তুই খুব প্রশংসা করলি না, ওটাই তো ফারুক ভায়ের।'

সাব্বির চোখ টিপলো। মানে চাপাটা ট্যাক্‌ল কর।

অপি বললো, 'ফারুক ভাই আপনি কেমন আছেন।'

ফারুক ভাবতে লাগলো, মেয়েটাকে কোথায় দেখেছি? কোথায় দেখেছি? কোনো আবৃত্তির অনুষ্ঠানে? মেয়েটা কি কোনো গ্রুপে আছে, আবৃত্তি-টাবৃত্তি করে!

'ভালো।'

'চিনতে পারছেন না। ওই যে আর্কিটেকচারের কোচিং ক্লাসে। আপনি আমার খাতায় লিখে দিয়েছিলেন—

কাঠবিড়ালীর চারা লাফায় উঠানে, জানো তার মানে?'

'ও মনে পড়েছে। অপি। অপি তো খুব সুন্দর হয়ে গেছো।'

মাইকে তখন সাব্বির ঘোষণা দিচ্ছে, সুধী আপনারা যারা এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করছেন, দয়া করে বসে পড়ুন। আমাদের অনুষ্ঠান এক্ষুনি শুরু হতে যাচ্ছে। বিশিষ্ট আবৃত্তিকার ফারুক আব্দুল্লাহ আমাদের মধ্যে এসে পড়েছেন।

'ফারুক ভাই, আমাকে আপনার মনে আছে।'

'হ্যাঁ, খুব। অপরাজিতা হক।'

অপি বিস্মিত হলো।

ফারুকের তাকে মনে আছে, তার কারণ জীবনের প্রথম অটোগ্রাফটি সে অপিকে দিয়েছিল। এরপর আবৃত্তি করতে গেলে এখানে ওখানে একটা দুটো অটোগ্রাফ সে হয়তো দিয়েছে, কিন্তু জীবনে প্রথম একটা মেয়েকে অটোগ্রাফ দেওয়ার ঘটনাটা সে স্মৃতির মধ্যে যত্ন করে তুলে রেখেছে। কী যে মনে হয়েছিল, সে শক্তির পদ্য থেকে উদ্ধৃত করেছিল।

অনুষ্ঠান শুরু হলো। প্রথমে আবৃত্তি। সাব্বিরের নেতৃত্বে একদল পাঞ্জাবি পরিহিত ছেলে, এবং শাদাশাড়ি নীল পেড়ে মেয়ে বৃন্দ-আবৃত্তি করতে লাগলো।

সবুজ ফোঁড়ন কাটলো, 'এই রে, শুরু হলো, পাখি সব করে রব।'

নব্বির বললো, 'পাখিই, তবে কোকিলও না, কবুতরও না, কাউয়া। এক কাকে কয় কা, সব কাকে জবাব দেয়, কা কা।'

মাইকে ফুঁ দিয়ে সাব্বির ঘোষণা করলো, আবৃত্তির পর বিশেষ আকর্ষণ সঙ্গীত। তার আগে, আবৃত্তির শেষ শিল্পী, দেশের খ্যাতনামা আবৃত্তিকার ফারুক আব্দুল্লাহ।

ফারুক আব্দুল্লাহ উঠলো।

অপির সঙ্গীরা বাদাম খাচ্ছে। মচমচ শব্দ হচ্ছে খোসা ভাঙার। অপির ভালো লাগছে না। একটা লোক গেস্ট হয়ে এসেছে তাদের ক্যাম্পাসে, তাদের কি কর্তব্য নয় তাকে আপ্যায়িত করা? নব্বির বললো, 'আবৃত্তিকারগুলো শ্বাস নেয় নাভি দিয়ে, কেমন শ্বাস মিশিয়ে কথা বলে— এমন ন্যাকাদের থাকা উচিত শুধু শান্তিনিকেতনে, কে দুয়ারে কাঁপন তুলছো, ও মলয়। হি হি হি।'

অপি বিরক্ত হলো। 'এই-নব্বির চুপ। ফারুক ভায়ের আবৃত্তি শুনতে দে।'

ফারুক আব্দুল্লাহ ততোক্ষণে মাইক ঠিক করে নিয়েছে।

www.shopnil.com

মাউথপিসের কাছে মুখ নিয়ে বললো, আজ আমি পড়বো সদ্যপ্রয়াত কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পদ্য।

ফারুক পড়তে লাগলো,

কাঠবিড়ালীর চারা লাফায় উঠানে
জানো তার মানে
দূরে গিয়ে দীর্ণ হও স্মৃতির উজানে
জানো তার মানে
কিছুই জানো না শুধু কষ্ট পেতে জানো
নষ্ট মেয়ে বার বার কষ্ট পেতে জানো।

অপি ভাবলো, এ যে তারই ছবি আঁকার খাতায় লিখে দেওয়া কবিতাটি।
এ-সব কি তবে তাকে উদ্দেশ্য করেই বলা!

এবার তিনি পড়ছেন:

ভালোবাসা পিঁড়ি পেতে রেখেছিলো উঠোনের কোণে।
কিন্তু সে পিঁড়িতে এসে এখনো বসেনি
কেউ ধীর পায়ে এসে, ত্রস্ত একা একা

কেউ সে পিঁড়িতে এসে এখনো বসেনি।

তাহলে তার ভালোবাসার পিঁড়ি এখনো ফাঁকা আছে। কেউ বসেনি। তিনি কি চান কেউ বসুক? চান কি? দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে গেলো অপির বুকের গভীর থেকে। কে এসে বসবে তাঁর পিঁড়িতে। অপি, বসে আছে সবুজ ঘাসে, হাঁটুর ওপরে মুখ। চোখ তুলে তাকালো মঞ্চের দিকে, মাইকের দিকে।

ওই ঠোঁট যেন তাকেই বলছে:

যদি কোনোদিন যাই মেঘের ওপারে
তোমাকেও নেওয়া যেতে পারে।
তারপরে পথ নেই। ফুটে আছে ফুলের প্রদীপ।

কী হলো অপি, তোমার। তোমার বুকের ভেতর কেমন করছে, হৃৎপিণ্ডে দুন্দুভি বাজছে, তুমি মুগ্ধতার ভেতরে ডুবে গেছো, প্রতিটা বাক্য মনে হচ্ছে তোমার জন্যেই নিবেদিত, প্রতিটি ইঙ্গিতও মনে হচ্ছে তোমার হৃদয়-দরজার কপাট খোলার জন্যেই উচ্চারিত। ব্যাপার কী, অপি?

গুড়ুম গুড়ুম বিশাল গর্জন করে দুটো ককটেল বিস্ফোরিত হলো মঞ্চের পেছনে। ধর ধর করে

একদল ছেলে হকিস্টিক নিয়ে উঠে পড়লো মঞ্চে। তারা একটানে ছিঁড়ে ফেললো, পেছনের ব্যানার। হকিস্টিকের বাড়ি দিয়ে ভাঙলো মঞ্চে রাখা ফুলের টব। মুহূর্তে ফাঁকা হয়ে গেলো চারদিক। অপির চারপাশের দর্শকশ্রোতা সব ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালিয়ে গেছে, দৌড়াতে গিয়ে কেউ কেউ স্যান্ডেল ফেলে গেলো, স্যান্ডেলের হিল বেঁকে যাওয়ার হোঁচট খেলো কেউ, আছাড় খেয়ে তড়িঘড়ি উঠে আবার দৌড়ানোর আগেই গায়ের ওপর দিয়ে দৌড়ে গেলো গোটা চারেক পা। অপি তাকালো মঞ্চের দিকে, কেউ নেই। ফাঁকা মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছেন ফারুক আব্দুল্লাহ, একা। কে একজন সন্ত্রাসী এক রিভলভার নিয়ে উঠে পড়লো মঞ্চে, আকাশের দিকে নল বাগিয়ে সে টিপ দিল ট্রিগারে, শব্দ হলো গুড়ুম, সে চিৎকার করে উঠলো—

সন্ত্রাস না শান্তি?

মঞ্চের পেছন দিকে একদল হকিস্টিকধারী স্লোগানের জবাব দিলো চিৎকার করে— শান্তি শান্তি।

অপি, ফাঁকা মাঠে একা, দৌড়ুতে লাগলো মঞ্চের দিক লক্ষ্য করে। ততোক্ষণে পিস্তলধারী এক ধাক্কা দিয়ে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দিয়েছে ফারুক আব্দুল্লাহকে। অপি গিয়ে ফারুকের হাত ধরলো। 'চলুন ও দিক?'

পিস্তলধারী তেড়ে এলো তাদের দিকে, 'জলদি ফুট, মাউড়ার পো, কবিতা চোদাও, হোগার মইদ্যে বন্দুকের নল ডুকায়া দিমু। হোগা দিয়া কবিতা বারাইবো শাউয়ার পো।'

অপি চারদিক তাকিয়ে খুঁজলো উদ্যোক্তাদের কাউকে দেখা যায় কিনা। না, কেউ নেই।

হাত ধরে টানতে টানতে ফারুক আব্দুল্লাহকে নিয়ে এলো টিএসসির ভেতরের বারান্দায়।

অপি তখনো হাঁপাচ্ছে। টিএসসির ভেতরে গিজগিজ করছে ছেলেমেয়ের দল। দু একজন মাথা বাড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করছে বাইরে মুক্তমঞ্চে আসলে কী হচ্ছে!

ফারুক আব্দুল্লাহ খানিকপর মুখ খুললো,

'ছেলেগুলো কারা? ওরা অনুষ্ঠানটা পণ্ড করলো কেন?'

ঘটনার আকস্মিকতা ও উত্তেজনার ঘোর কাটেনি অপির।

টিএসসি একটা অদ্ভুত জায়গা। একটা বড়ো গোলযোগের পাঁচ মিনিটের মাথাতেই সব কিছু আগের মতো হয়ে যায়, পথের ধারে স্টলগুলোতে কাস্টোমার খলবল করে, কড়াইয়ের তেলে পিঁয়াজু লাল হতে থাকে, সমস্ত রাস্তাটা আবার থই থই করে জনতায়, যেন কিচ্ছু ঘটেনি কোথাও।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বাইরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক।

সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে, বেশ অন্ধকার নেমে এসেছে, অপি বললো, 'এরপর গেলে একা একা ফেরা যাবে না। ফারুক ভাই। আমাকে যে যেতে হবে।'

'তুমি একা একা যাবে নাকি?'

'হ্যাঁ। বীরেরা তো পালিয়ে গেছে।'

'ঠিক আছে। চলো আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'আপনি দেবেন?'

'কোনো অসুবিধা আছে।'

www.shopnil.com

অপি মাথা নাড়লো, মনে মনে বললো, নেই নেই। এইটিই তো আমি চাইছি।

টিএসসি থেকে ওয়ারি। খুব দূরের পথ নয়। রিকশায় অপি বসলো বাঁ পাশে। মেয়েদের বাঁদিকে বসতে হয়।

সেদিনই যে প্রথম অপি কোনো পুরুষের পাশে রিকশায় উঠলো, তাতো নয়। তার ক্লাসমেটদের সঙ্গে এখানে-ওখানে সে রিকশায় গেছে-টেছে, এটা কোনো উল্লেখ করার মতো ব্যাপারই নয়।

আর প্রেমের প্রস্তাব যে এ জীবনে এক আধবার পায়নি, তাও নয়। হ্যাপি ভাইয়া অ্যামেরিকা থেকে এটা ওটা উপহার পাঠায় বাসায়। প্রথমদিকে প্রাপকের তালিকায় তার দু বন্ধু বাবুল ও সিন্‌হাও থাকতো। উপহার এলে অপি হ্যাপির দু বন্ধুকে ফোন করে বলতো বাসায় চলে আসতে। বাবুল আসতো, সিনহা আসতো। তাদের সামনে যাওয়া, তাদের চা-টা খাওয়ানো, তাদের সঙ্গে গল্প করা— এসব তো হ্যাপি করতো, অসংকোচেই।

দুজনের মধ্যে বাবুল বেশ দিলখোলা টাইপ, জোরে জোরে হাসে, বেশ জোকটোক বলে। হয়তো বললো, অপি বেগম, আজ কী হয়েছে জানো, আমার ভাগ্নি বলছে, মামা, আগামী সোমবার সমুদ্রে যাচ্ছি আমরা সবাই। আমি বললাম, কেন মা, আগামী সোমবার কেন, আজই যাও। ভাগ্নি বলে কী জানো, বলে, আজ তো শনিবার, সমুদ্র বন্ধ। হা-হা-হা।

অন্যদিকে সিনহা চুপচাপ। নটরডেমের ছাত্র ছিল, ভাবুক প্রকৃতির ছেলে, চোখেও একটা ভাবুক আকৃতির চশমা। সে অপিকে ডাকে আপনি আপনি করে। তো একদিন সিনহা ফোন করলো নিজে থেকে, চাইলো অপিকে। হ্যালো, অপি, আপনার কি সময় হবে, আগামী বুধবার, দুপুরে।

: কেন বলেন তো।

: না, আপনার সঙ্গে একটু কথা বলব।

: খুব জরুরি কিছু?

: হ্যাঁ, খুব জরুরি।

: ঠিক আছে, চলে আসেন বাসায়।

: না, বাসায় না। চলুন বাইরে কোথাও। আপনি আমার সঙ্গে লাঞ্চ করতে পারেন?

: হ্যাঁ। পারি। কোথায় করাচ্ছেন?

: সুং গার্ডেনে আসেন। দুপুর ঠিক সাড়ে বারোটায়।

: ওই সময় তো ক্লাস আছে। দেড়টার দিকে আসি?

: আসুন। তা হলে বুধবার দুপুর দেড়টায় সুং গার্ডেনে দেখা হচ্ছে।

অপি তো পুরো বাসায় হৈ চৈ ফেলে দিলো। সিনহা ভাই আমাকে চাইনিজ খাওয়াচ্ছেন। বিশেষ ঘোষণা, বিশেষ ঘোষণা।

মামা বললেন, তুই কি একা একা যাবি?

অপি বললো, জ্বি মামা।

: সেটা কি উচিত হবে। দিনকাল ভালো না।

: কোন দিনকাল। দৈনিক দিনকাল?

: আরে না। সময়। দেশের পরিস্থিতি। যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয়। একা একা যাস না।

: জ্ জ্ জ্ জোয়ান কাউকে সঙ্গে নিতে হবে?

: নেওয়া উচিত না? চাইনিজে তো দুজনের যা খরচ, তিনজনেরও তাই। সিনহা খুব ভালো ছেলে, ও কিছু মনে করবে না।

: মামা, তুমি খালি জোয়ানই হলে। বুদ্ধিসুদ্ধি হলো না তোমার। তুমি গেলে মামা পুরো বিল তো তোমাকেই পে করতে হবে।

: তাই নাকি?

: হ্যাঁ, তুমি মামা না?

: তা অবশ্য ঠিক। আসলেই মামা হওয়াটা সুবিধার না।

: মামা, মন খারাপ করো না। আমার বান্ধবীদের একদিন খাইয়ে দিও। জোয়ান পুরুষ তো! হি হি হি।

তো সুং গার্ডেনে যথাসময়ে গিয়ে দেখা গেলো, রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিনহা কুলকুল করে ঘামছে।

স্যুপ খেতে খেতে সিনহা বললো, দেখুন অপি, আমি খুব স্ট্রেট ফরোয়ার্ড ছেলে। আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।

: জি বলেন।

: আমি আপনাকে ভালোবাসি। আপনার কোনো অবজেকশন আছে?

: না। আপনার কোনো ব্যাপারে আমি অবজেকশন জানাবো কেন?

: এখন বলুন, ডু ইউ লাভ মি?

: অতীতে কখনো বাসি নাই। আজকেও বাসি না।

: ইন ফিউচার। আপনি কি আমাকে ভালোবাসতে পারেন?

: আমার মনে হয় না।

: আপনাকে আরেকবার ভেবে বলার চান্স দিতে চাই। খাওয়া শেষ হলে আপনি আবার বলবেন। এখন আপনি ভাবতে থাকুন।

খাবার-দাবার এলো। অপির কোনো ভাবান্তর নেই। সে বেশ মন দিয়েই খাচ্ছে। সামনের লোকটা গম্ভীর। মনে হচ্ছে তার জীবন-মরণ সমস্যা। খাওয়া শেষ হলে সিনহার প্রশ্নের জবাব দিতে হলো : আমি বেশ ভেবেটেবে দেখলাম অদূর ভবিষ্যতে আপনাকে ভালোবাসার কোনো সম্ভাবনা আমার নাই। আপনি কি মনখারাপ করলেন?

'মন খারাপ করলে তুমি কী করবা— হাসিবাড়ি হাসিবাড়ি খেলবা'— সিনহা রেগে গেলে না।

'আপনি কিন্তু আমাকে আপনি করে বলতেন। আর শুনুন, আমাদের বাড়ি নিয়ে আপনি কিছু বলবেন না, প্লিজ। আমি এখানে এসেছি, এটা আমার ব্যাপার। হাসিবাড়ির নয়।'

'সরি। আমি কি আপনাকে একটা রিকোয়েস্ট করতে পারি?'

'জি। করেন।'

www.shopnil.com

'আমার ব্যাপারটা আপনি আপনাদের বাসায় বলবেন না। বললে এটা হবে হাসির এটম বোমর।'

'ঠিক আছে বলবো না।'

অপি কথাটা রেখেছে। কারো কাছে কোনোদিন সিনহার প্রপোজালটা ফাঁস করে দেয় নি।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পাশ দিয়ে, দোয়েল চত্বর হয়ে রিকশা চলেছে। দুজনেই নীরব। অপির কী যে ভালো লাগছে, এই লোকটার পাশে বসে। শুধু পাশাপাশি বসে থাকা— এতেও এতো সুখের অনুভূতি জন্ম নিতে পারে!

নীরবতা ভঙ্গ করলো অপিই প্রথম। 'আপনি খুব ভালো আবৃত্তি করেন।'

'তোমার ভালো লেগেছে?'

'হ্যাঁ, খুব ভালো।'

'তুমি এখন কী করছো অপি।'

'সোশলজিতে অনার্স পড়ছি। অনার্স থার্ড ইয়ার।'

'আপনি?'

'আমি তো বুয়েট থেকে পাস করে বেরিয়েছি সেও একবছর হলো। কিছু করি না।'

'কিছুই না?'

'বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় পাজ্‌ল বানিয়ে দেই। পত্রিকায় ছাপা হয় না— শব্দযোগ, শব্দজট, তারপর নিচের ছবিতে কোন্ খরগোশটি তার কোটরে পৌছতে পারবে— এইসব প্রশ্ন আর উত্তর পাঠাই।'

'আর কিছু করেন না?'

'করি। আবৃত্তি করি।'

'শুধু এসব করলে চলবে?

'পাকা গিন্নির মতো কথা বলছো দেখি। চলছে তো।'

'এখন চলছে। ভবিষ্যতে কী হবে?'

'আমার আবার ভবিষ্যত কী? আমি তো ঠিক করেছি বিয়ে-শাদী কিচ্ছু করবো না। কনফার্ম ব্যাচেলর থেকে যাবো।'

'এমন রোমান্টিক রোমান্টিক কবিতা পড়েন। আর ভাবেন বিয়ে-শাদী করবেন না। আপনার উদ্দেশ্যটা কী মশায়?'

'কোনো উদ্দেশ্য না রাখাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য'।

'আর্কিটেকচার প্রাকটিস করবেন না?'

'কখনো ভালো লাগলে করবো। আসলে আমি ভাবছি। এই যে উঁচু উঁচু বিল্ডিং হচ্ছে, এটা কি ঠিক হচ্ছে? মাটির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক থাকবে না!'

'ভাবছেন। ভালো।'

অপি চিন্তায় পড়ে যায়। সামনে গুলিস্তান। আর সামান্য পথ। গুলিস্তানে যেন আজ জ্যাম থাকে। যেন জ্যাম থাকে।

'আপনি আর্কিটেকচার পড়তে গেলেন কেন? একটা সিট শুধু শুধু নষ্ট।'

'আরে আমি পড়তে চেয়েছি নাকি। রংপুরের ছেলে আমি। কারমাইকেল কলেজে পড়েছি। আর শহরে নানা উটকো কালচারাল একটিভিটিজ করেছি, বুয়েটের আর্কিটেকচারে ভর্তি পরীক্ষা দিলাম। গাইড কিনতে পাওয়া যায়। কোচিং করতে হয়— এসব আমি জানতামই না। সোজা পরীক্ষা হলে ঢুকেছি। অংকের কোশ্চেন ছিল খুব সোজা। সব পারলাম। পারার কারণ আই এসসি পরীক্ষার পর অংকের প্রাইভেট টিউটর বনে গিয়েছিলাম। আর সাধারণ জ্ঞান। সব বানিয়ে বানিয়ে উত্তর দিলাম। মানববসতি নিয়ে কী একটা আলোচনা ছিল। 'দাও ফিরিয়ে সে অরণ্য' টাইপ কবিতা দিয়ে খাতা ভর্তি করলাম। আর এসেছিল ছবি আঁকা। ওটা আমি চালালাম ফ্রি স্টাইলে। দরজার সেকশন আঁকতে বলেছিল। মানে বুঝিনি বলে দরজার সব পার্ট ছিঁড়ে খুলে আঁকলাম। হা হা হা। তারপর কী হলো জানো। ৩৫০০ ছেলেমেয়ে পরীক্ষা দিলো। আমি হলাম ৮ নম্বর। লটারির টিকিট পাওয়ার মতো।'

'সহজে পেয়েছেন বলে হেলাফেলা করছেন?'

'হতে পারে।

মানুষ এমন তয় একবার পাইবার পর
নিতান্ত মাটির মনে হয় তার সোনার মোহর।'

'আপনি সব সময় বই না দেখে কবিতা আবৃত্তি করেন?'

'চেষ্টা করি। ভুলে গেলে দেখি। একবার এ-রকম হয়েছিল। রংপুর জিলা স্কুলে। বার্ষিক মিলাদের আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হয়েছি। পুরস্কার বিতরণ ও মিলাদের অনুষ্ঠানে কবিতা পড়তে হবে। নজরুলের ফাতেহা-ই ইয়াজদহম। এ কি বিস্ময় আজরাইলেরও জল ভরভর চোখ, 'বেদরদ দিল কাঁপে থর থর যেন জ্বর জ্বর শোক। দুলাইন বলে গেলাম ভুলে। মিনিটখানেক চুপ করে থেকে স্মার্টলি পকেট থেকে কাগজ বের করে বাকিটা পড়লাম।'

অপি অবাক হয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে। কী গমগমে গলা। উঁচু নাক, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। গুলিস্তানের ফ্লাশলাইটের আলোয় মনে হচ্ছে সোনার ভাস্কর্য। গ্রীক মিথোলজির কোনো চরিত্র। লোকটার কতোগুলো কবিতা মুখস্থ?

'শক্তি চট্টোপাধ্যায় বুঝি আপনার খুব ভালো লাগে?' বদমাসগুলো আপনার কবিতা পড়া তো শেষ হতে দিলো না। কী লজ্জার কথা। আপনাকে ইনভাইট করে এনে এভাবে ফেলে রেখে সবাই পালিয়ে গেলো।'

অপির মনে পড়লো পিস্তলধারীর গালিগালাজগুলো। বদমাসটা ফারুক ভাইকে বাজে কথা বললো কেন?

কেন বলবে? এই সব পিস্তলধারীর কাছে কেন ভালো মানুষগুলো অসহায় হয়ে থাকবে! অপির গাল ফুলতে থাকলো।

কণ্ঠে বাষ্পরাশি এসে জমে চাপ সৃষ্টি করছে, চোখের মধ্যে বাষ্পকণা জমে বড়ো বড়ো ফোঁটায় আকার পরিগ্রহ করছে, তারপর ইয়া বড়ো বড়ো ফোঁটায় জল বেরুতে থাকলো।

'কী মুশকিল। কাঁদছো কেন?'

www.shopnil.com

'আমাদের অনুষ্ঠানে এসে আপনি আমাদের কী চেহারা দেখে গেলেন। ছি ! ওরা কি মানুষ !'

'বাদ দাও। এই অপি। কেঁদো না।' ফারুক মুশকিলে পড়লো। তার কী করা উচিত? সেকি এখন এই মেয়েটির চোখের পানি মুছে দেবে? সিনেমার মতো?

'শোনো'—উপায়ন্তর না দেখে ফারুক বললো, 'আমি আজ শেষ করতাম কোন কবিতাটা দিয়ে, জানো?'

কান্নাভাঙাস্বরে অপি বললো, 'কোন কবিতা দিয়ে?'

আবৃত্তিকারদের মতো, নাভি থেকে শ্বাস এনে, ফারুক বললো—

সাবলীলভাবে আমি ভালোবাসা বাসিব তোমারে
দুটি হাত ধরে ধীরে কথা যেন কর্ণেরে উন্মুখ করে.....।

কখন অলক্ষ্যে অপি হাত ধরেছে ফারুকের। এ এক অসম্ভব সন্ধ্যা। অবাস্তব।

এই সন্ধ্যা কি বাস্তবে ঘটছে! এমন আকাশের মতো গুলিস্তান, মেঘের মতো পিচঢালা পথ, এমন কাগজের এরোপ্লেনের মতো রিকশা এবং এমন স্বপ্নপথের পথিকের মতো দুটো মানবমানবী!

সময় এই দৃশ্যে এসে থমকে যায়, পৃথিবীর সব ঘড়ির কাঁটা দাঁড়িয়ে এক মিনিট সম্মান করে। এই দৃশ্যে অমরতা— এই দৃশ্য দৈনন্দিনের ঝুলকালি-ঘাম দিয়ে মোড়া নয়।

গুলিস্তান পেরিয়ে এসে গেলো ওয়ারি। অপির হুঁশ হলো এটা তাদের পাড়া। সে ফারুকের হাত ছেড়ে দিলো।

বাসার সামনে এসে অপি বললো, 'ফারুক ভাই, প্লিজ বাসায় একটু আসেন। প্লিজ।'

ফারুক বললো, 'আজ আর না অপি। আরেকদিন আসবো।'

'আসেন না ফারুক ভাই।'

'না। আজকে ভাল্লাগছে না। আরেকদিন আসা যাবে।'

'আরেকদিন আসবেন? আসবেন তো? আসতে কিন্তু হবেই?'

'হ্যাঁ। আসবো।'

'ঠিক আছে। আপনার অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে। থ্যাংক ইউ। দেখা হবে।'

যে রিকশায় এসেছে, সেই রিকশাতেই ফারুক আব্দুল্লাহ বিদায় নিলো।

সারাটা সন্ধ্যা ভালোলাগার আবেশে অপির মনটা আচ্ছন্ন হয়ে রইলো। রাত যতোই বাড়তে লাগলো— সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টিপ তুলছে, লিপস্টিক তুলছে, কানের দুল খুলছে, আর নিজেকে দেখছে— তার মনে হতে লাগলো, এই সন্ধ্যাটা বাস্তবের নয়, আজকের নয়, হয়তো সে জাতিস্মর, পূর্বজন্মের কোনো স্মৃতি তার মনে পড়ছে। কিংবা সে কোনো একটা স্বপ্নদৃশ্যের মধ্যে আছে, ঘুম ভেঙে গেলেই সব কিছু ভেঙে যাবে, অবাস্তব মনে হবে।

বাথরুমে ঢুকে শাড়ি খুলে সে তাকিয়ে রইল আয়নায়। শুধু সায়া-ব্লাউজে মহিলাদের দেখায় ভয়াবহ, কিন্তু ওই তন্বী তরুণীটিকে, আয়নায় তার নিজের কাছে তো বটেই অন্য

কেউ দেখে ফেললে তার কাছেও, কেবল পরীদের মেয়ে ছাড়া অন্য কিছুই মনে হতো না।

অপি কাপড়-চোপড় ছেড়ে দাঁড়ালো শাওয়ারের নিচে, শাওয়ার ছাড়লো, পানি পড়ছে, সে অন্যমনস্ক, রিকশায় যখন সে তার পাশাপাশি, তার তলপেটে কেমন গুড়গুড় করে উঠেছিলো, অন্যমনস্কভাবেই সে আয়নার সামনে দাঁড়ালো— তাকালো নিজের দিকে, নিজের শরীরটা আজ তার কাছে হঠাৎ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো, তার শরীরের সব কিছু, এমন কি প্রতিবিম্বটাও; শরীরে জলকণা ফোঁটা ফোঁটা, বড়ো ফোঁটাগুলো ভেঙে ভেঙে গড়িয়ে জলরেখার আকার নিচ্ছে। ঠাণ্ডা লেগে যাওয়ার আগেই ক্রিমকালার রাত্রিপোশাক পরে চুলে তোয়ালে পেঁচিয়ে সে বাথরুম ছাড়লো।

ঘুম আসছিল না। নানা কথা মনের ভিতরে। আপন মনেই সে রচনা করছে কল্পিত সংলাপ, ফারুকের সঙ্গে। হঠাৎ মনে হলো, হায়, লোকটার ঠিকানা-ফোন নাম্বার সে তো কিছুই রাখেনি। তবে তিনি কথা দিয়েছেন, এ বাসায় আবার আসবেন। নিশ্চয় আসবেন। নিশ্চয়।

বিড়বিড় করতে করতে অপি ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুম ভেঙে গেলো মাঝরাতে। চাঁদের আলোর আঘাতে। ক্রিমকালার রাত্রিপোশাক হাঁটুপর্যন্ত উঠে গেছে। শরতকালের স্নিগ্ধ রাত। ফুলের গন্ধের মতো শিশির নামছে।

তারপর বারান্দায় গিয়ে ধীরে ধীরে সে প্রবেশ করলো অনর্গল কান্নার ভেতরে। কাঁদতে তার ভালো লাগছে। তারাশঙ্করের কবি কি আর এমনি গেয়েছিল—

"আমি ভালোবেসে এই বুঝেছি—
সুখের সার সে চোখের জলেরে!
তুমি হাস— আমি কাঁদি
বাঁশি বাজুক কদম তলে রে।

www.shopnil.com

বৃষ্টির ফোঁটাকে মনে হয় তোমার পায়ের শব্দ
পাতার শব্দকে মনে হয় তোমার গাড়ির আওয়াজ

এখন এই মেয়েটা, অপি, কী করবে? প্রতিটা মানুষের একটা মন থাকে, সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতো বুকের পাথরের নিচে চাপা, কোনো একদিন তার ঘুম ভাঙে, তখন শুধুই অগ্ন্যুৎপাত— কতো জ্বালা, কতো আগুন, কতো শব্দ। কিন্তু সবুজ শ্যামল শান্ত মূক পাহাড়, তার সবুজ বনানী, তার স্রোতস্বিনীর কল্লোল, তার গায়ের পাখিপতঙ্গ ভীরু প্রাণগুলোকে দেখে কে বলবে,— এ পাহাড়টির মধ্যেও যন্ত্রণা আছে।

মানুষের মন! যেন হ্যান্ড গ্রেনেড। যতোক্ষণ তুমি তার সেফটি পিনটা না খুলছো, ততোক্ষণে সে একটা সামান্য নির্বিবাদ পাথর। কিন্তু তার পিনটা খুলে নেওয়া হলে! মনেরও থাকে একটা সেফটি পিন, মানুষে মানুষে হৃদয়ে হৃদয়ে রোজ কতো টক্কর কতো ঠোক্কর, কিন্তু যতোক্ষণ সেফটি পিনটা লাগানো আছে, ততোক্ষণ একটু কথা, একটু দেখা, একটুখানি হাসি বিনিময়, একটুখানি দীর্ঘশ্বাস, একটুখানি হাতে হাত, চোখে চোখ— তবুও কোনো বিস্ফোরণ নয়।

অপির মনের বিস্ফোরক-চাবিটা খুলে গেছে। এখন আর ফেরার কোনো উপায় নেই। এখন তার হৃদয়ে ঘটে চলেছে রক্তক্ষরণ।

এখন আমি তাকে কোথায় পাব? কেমন করে তার দেখা পাব। তার একটুখানি কথা শুনতে পাব কী করে? শুধুই যে তাকেই মনে পড়ছে। কতো বদলে গেছে লোকটা। চুল ছোটো করেছে, বেশবাস এখন কতো পরিপাটি!

অপি তার ছবি আঁকার পুরোনো খাতাটা বের করলো, সেই অটোগ্রাফখানি—কাঠবিড়ালীর চারা লাফায় উঠানে, জানো তার মানে। সে খাতা মেলে ধরে তাকালো হলদেটে পাতার দিকে, ফারুক আব্দুল্লাহর স্বাক্ষরটির দিকে তাকিয়ে রইলো— তার ভালো লাগছে। চোখ টলমল করে উঠছে।

তার টেলিফোন নাম্বারটা কেন অপি রেখে দেয়নি?

নিজের নাম্বারটাই বা কেন তাকে দিলো না। কেমন করেই বা দিতো! যদি এমন হতো, কাল রিকশায় সে বলছে, ফারুক ভাই, আমার টেলিফোন নাম্বারটি রাখুন। সে উদাস কণ্ঠে জবাব দিচ্ছে— কেন, ফোন নাম্বার দিয়ে আমি কী করবো? তখন কী হতো!

ফারুক কি তার মনের কথা বুঝতে পেরেছে। জান, জান, তুমি কি আমার হৃদয়ের ভাষা পড়তে পারো নি?

নিশ্চয় পেরেছে। না হলে সে কেন কাল শুধু শক্তির পদ্যই পড়লো। আর কী সব পঙ্‌ক্তি। অপি আজ সব ভুলে গিয়ে বসে আছে। কিন্তু কবিতাগুলোর মেসেজ তার কানে এখনো বাজছে। আর রিকশায় কেমন করে বললো—সাবলীলভাবে আমি ভালোবাসা বাসিব তোমায়!

একটা কাজ করলে কী হয়। নিউমার্কেটে গিয়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার বই কিনে আনলে? ওই কবিতাগুলো খুঁজে বের করে পড়া যায়। কিন্তু সে যদি হঠাৎ করে এসে পড়ে। এসেই বলে, হা-হা-হা অপি, চলে এলাম তোমাদের বাসায়, ভাবলাম কথা যখন দিয়েছি, তখন আর দেরি করে কী লাভ। আজই দায়শোধ করে আসি!

কিন্তু সে আসবে না। আমি জানি জানি, সে আসিবে না, এমনই কাঁদিয়ে পোহাইবে যামিনী, বাসনা তবু পুরিবে না। ঘর অসহ্য মনে হচ্ছে, বাইরে গেলে যদি শান্তি আসে। অপি চটপট বেরিয়ে পড়লো, রিকশায়। নিউমার্কেটের দোকান থেকে কিনলো শক্তির পদ্য সমগ্র। পাঁচশ টাকার নোট, দোকানি বললো, একটু অপেক্ষা করেন, ভাঙতি করে এনে দিচ্ছি। একটা পিচ্চি গেলো খুচরোর খোঁজে। এতো দেরি করছে কেন ছেলেটা? অপির এখন অসহ্য লাগছে বাহির। মনে হচ্ছে ঘরে ফিরে যাওয়া দরকার তাড়াতাড়ি। সে যদি আসে, যদি তাকে না পেয়ে ফিরে যায়। প্রেম একবার এসেছিল নীরবে আমার দুয়ারপ্রান্তে, সে তো হায় মৃদু পায়, এসেছিল পারিনি তা জানতে। না, তা হতে দেওয়া যায় না।

রিকশায় এসে, সে ফিরে গেলো স্কুটারে। বাসায় পৌঁছে সে সোজা গেলো দাদির কাছে, 'দাদি, দাদি। বাসায় কি আমার কাছে কেউ এসেছিল?'

দাদি হাসলেন। 'কার আসার কথা ছিল রে?'

'না, কারুরই আসার কথা না।'

অভিমান, অভিমান। কে আসবে, কেউ আসবে না। জনমের এ পোড়া ভালে কোনো আশাই মিটিবে না। অভিমানই বা কেন? কার ওপরে। এমন কোনো সম্পর্ক নয়। এমন কোনো কথা হয় নি। কেউ কাউকে কোনো অঙ্গীকার করে নি।

এতো বয়েসি একটা লোক, নিশ্চয় প্রেম-ট্রেম করে। নিশ্চয় কারো কাছে বাঁধা পড়ে আছে। আবার চোখ ভিজে উঠতে চাইছে।

বাসার সবাই টেলিভিশন দেখছে।

শুক্রবার। টিভিতে এ সপ্তাহের নাটক হচ্ছে। হয়তো ভালো হাসির নাটক। ও ঘর থেকে হাসির শব্দ আসছে। হাসিবাড়ির সদা চর্চিত কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিক হাসি। খারাপ নাটক হলেও অসুবিধা নেই। দ্যাখ, দ্যাখ, মেয়েটা কেমন রোবটের মতো সংলাপ বলছে, এ কে? নিশ্চয় প্রযোজকের ছোটো শ্যালিকা। হা হা হা। হাসির উপকরণের কোনো অভাব নেই এ-বাড়িতে।

মা বললেন, 'অপি কোথায়। ও টিভি দেখবে না? এমন একটা ফানি নাটক।'

মামা বললেন, ফান বেশি হয়ে গেছে। একটু পানি ঢেলে দিলে জিভে ধরতো না। দেবো নাকি জিটিভি ছেড়ে। আন্ত্যাক্ষরী হচ্ছে।'

www.shopnil.com

তার হাতে রিমোট। তিনি উশখুশ করছেন।

বাবা বললেন, 'কী রে বল্টু। তুই যে একেবারে তথ্যমন্ত্রী হয়ে গেলি। রিমোট আমার হাতে। আমার টেলিভিশন, আমি যেমন ইচ্ছা তেমন করে চালাবো।'

সবাই হাসছে।

দাদি বললেন, 'আস্তে হাসো, আস্তে হাসো। নাটকের নট-নটীরা ডায়লগ ভুলে যাচ্ছে।'

আবার হাসি।

মা ফের বললেন, 'অপি মেয়েটা একা একা কী করছে?'

শরীর-টরীর খারাপ না তো।

দাদি বললেন, 'কাল নাকি কী পরীক্ষা। টিউটোরিয়াল না জানি কী। খুব ব্যস্ত। পড়ছে।'

দাদির কথা আংশিক মিথ্যা। আংশিক সত্য। অপি পড়ছে। গভীর আগ্রহে নতুন কেনা কবিতার বইটা ওল্টাচ্ছে। ফারুকের পড়া কবিতাগুলো পেয়ে যাচ্ছে। আর মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। এসব কথা কি কবির মনের কথা, নাকি আবৃত্তিকারেরও। যদি কোনোদিন যাই মেঘের ওপারে, তোমাকেও নেওয়া যেতে পারে। চলো না যাই, মেঘের ওপারে। জান, জান্টু পুটু।

সে ইয়েলোমার্কার নিয়ে এলো। এসব স্বর্ণাক্ষরে লেখা পংক্তিগুলোয় সোহাগা ঢাললো। সোনায় সোহাগা!

একটা রাত কাটিয়ে দেওয়া যাবে এই করে করে। তুমিহীন তোমার সঙ্গে।

বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে সেখানে ছিলাম আমি

ফারুক আব্দুল্লাহ মানুষটা একটু ব্যতিক্রমী ধরনের বটে। সে যদি উদ্যমী হতো, সাফল্য তার করায়ত্ত হতে পারতো, বিপুলভাবে। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে সে যদি পড়াশুনায় সিরিয়াস হতো, হয়তো ফার্স্ট-সেকেন্ড হয়ে এখন স্কলারশিপ নিয়ে পড়াশুনা করতে যেতো আমেরিকায়-বিলাতে। এখনো সে যদি তার ডিগ্রি ও বিদ্যা ফলাতে চায়, ঢাকা শহরে অর্থ-উপার্জন কোনো কঠিন বিষয় নয়। কিন্তু কী এক ঔদাস্য তাকে জীবনের ইঁদুরদৌড় থেকে নিবৃত্ত করে রেখেছে। একবার সে ঠিক করেছিল রণেশ দাশগুপ্তের মতো চিরকুমার চিরপবিত্র কমিউনিস্ট হয়ে যাবে, একাকী ভাড়া ঘরে এবং ভাঁড়ার ঘরে বই পড়ে পড়ে জীবন কাটিয়ে দেবে । তবে কমিউনিজমের বিশ্বব্যাপী বিপর্যয়ের পর কমিউনিস্ট সোভিয়েতের অসঙ্গতি, নিষ্ঠুরতা ও আমলাতান্ত্রিক কপটতার নানা গল্প শুনে তার মোহভঙ্গ ঘটেছে। দেশের মানুষ যা চায় না, তা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার অধিকার কারো নেই।

ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করে বেরিয়ে সবাই যখন ক্যারিয়ার ক্যারিয়ার করে এদিক ওদিক ছুটতে লাগলো, সে তখন ভাবলো, একটু আবৃত্তি চর্চা করে দেখি না কেন? এ বিষয় নিয়ে সে যে তুঙ্গে পৌঁছবে, এমনটা আশা করা বাড়াবাড়ি। কারণ এর আগে সে কিছুদিন বের করেছিল বাচ্চাদের বিজ্ঞানের পত্রিকা সায়েন্স ওয়ার্কশপ। ওই কাজটা সে করেছিল মিশনারি উৎসাহ নিয়ে।

তার নৈতিক চরিত্র ভালো, এই ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট কিন্তু নিঃসন্দেহে দেওয়া যায়। এখন সে পত্রপত্রিকায় পাজ্‌ল লিখে খায়, কথাটা ঠিক। একটা দৈনিক পত্রিকায় রোজ বেরোয় তার শব্দের খেলা, ওখান থেকে সে পায় মাসে তিন হাজার। একটা সাপ্তাহিক থেকে আসে মাসিক দুহাজার। পাঁচ হাজার টাকাই সে ঠিক ব্যয় করে কুলোতে পারে না। ঢাকায় তার একমাত্র বোনটি থাকে, বিবাহিত, বোনের বাসায় ফারুক রাত্রি কাটায়। মা-বাবা রংপুরে থাকেন, বাবা রিটায়ার্ড হেডমাস্টার, রংপুরে বাড়ি করেছেন, জমি কিনেছেন। সেখানে তিনি এখন ব্যাণিজ্যিকভিত্তিতে আনারস চাষ করছেন। ভালো আছেন, বলা যায়। সেটা ফারুকের একটা ভরসা। কোনোদিন ঢাকা ভালো না লাগলে রংপুরের খামারে রজনীগন্ধা চাষ করে খাওয়া যাবে।

ইউনিভার্সিটির বন্ধুদের সঙ্গে ফারুকের ইদানীং যোগাযোগ হয় না। তাদের ছিল পাঁচজনের একটা গ্রুপ, এর মধ্যে একজন ছিল মেয়ে। তানিয়া। সে বিয়ে করেছে দু ব্যাচ সিনিয়র একজনকে, যিনি ওই ডিপার্টমেন্টেই যোগ দিয়েছিলেন শিক্ষক হিসেবে, এবং এখন উভয়েই পড়াশুনা করছে অ্যামেরিকায়। ফারুকের খুব ভালো বন্ধু ছিল মোহন, সে টিভিতে ছায়াছন্দ

www.shopnil.com

উপস্থাপনা করতো, তার আগে করতো টিভি বিতর্ক। সে দিন মোহনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল রাস্তায়। ফারুক তখন রিকশাঅলাদের পাশে বসে মগবাজারের মোড়ে ইটালিয়ান হোটেলে চিতোই পিঠা খাচ্ছে। তার পরনে যথারীতি জিন্‌স, তবে পায়ে স্পঞ্জের স্যান্ডেল। হঠাৎ দেখলো, মোহন যাচ্ছে, একটা শাদা রঙের টয়োটা সলিলে, পেছনের সিটে বসে।

যানজটে গাড়িটা ফুটপাতের গা-ঘেসে বিরক্তিতে ফুঁসছে। ফারুক বেঞ্চে রাস্তামুখো হয়ে বসে রাস্তা দেখছে। রিকশার ভিড়ে গাড়িটা, হংস মাঝে বক যেন। ফারুকের মনে পড়ে গেলো জীবনা নন্দ দাশের কবিতার—

একটি মোটর কার গাড়লের মতো গেল কেশে
অস্থির পেট্রল ঝেড়ে— সতত সর্তক থেকে তবু
কেউ যেন ভয়াবহভাবে পড়ে গেছে জলে।

তখন হঠাৎই মোহন তাকে লক্ষ্য করলো, ডাকলো, 'এই ফারুক, কী করছিস।'

'চিতোই পিঠা খাই, খাবি?'

'নাহ্। গাড়ি রাখবো কোথায়?'

'ওই জ্যাম সাত ঘন্টা থাকবে। নেমে আয়। কিছু হবে না।'

'তুই আয়। ওঠ গাড়িতে।'

ফারুক উঠলো, বললো 'জব্বর গাড়ি কিনেছিস।'

টি টি টি টি। মোবাইল ফোনের রিং। মোহন তিন চার বার হ্যালো হ্যালো বলে রেখে দিল। অন্যপাশ থেকে সাড়া আসছে না।

'তো কী করছিস এখন'— ফারুক বললো।

'প্যাকেজ প্রোগ্রাম বানাচ্ছি।'

' প্যাকেজ ! সেটা কী?'

'টিভির জন্যে প্রোগ্রাম। বাইরে বানিয়ে বিক্রি করি।'

'কী দরে বেচিস। সের দরে না গজফিতা ধরে।'

'না। টাইম অনুযায়ী। ৩০ মিনিট, ৬০ মিনিট।'

'যতো লম্বা ততো দাম, না যতো ছোটো ততো দাম?'

'মানে কী?'

'ধর বনসাঁই। যতো ছোটো, ততো দাম। আবার ধর বটবৃক্ষ। যতো বড়ো ততো দাম।'

'তুই কি রসিকতা করছিস?'

'পাগল ! তোর কাজ নিয়ে আমি রসিকতা করবো কেন?'

আবার মোবাইল বেজে উঠলো। মোহন কাকে যেন ম্যাডাম ম্যাডাম বলছে।

কথা শেষ হলে মোহন বললো, 'সবিতা। ফিল্মের নায়িকা। আমার নেক্সট প্রোগ্রামটা ভাবছি একে দিয়েই উপস্থাপন করাবো।'

'ভালো। আর্কিটেক্টগিরি করছিস না?'

'করছি। বড়ো একটা ইউনিভার্সিটি কমেপ্লেক্সের কাজ পেতে যাচ্ছি। তখন তো তোকেও

লাগবে ফারুক। তুই হেল্প করিস। নে। আমার কার্ড। মোবাইল নাম্বারটা লিখে নে। ফোন করিস।'

সোনারগাঁও হোটেলের সামনে আবার জ্যাম।

ভিক্ষুকরা ঘিরে ধরেছে। ফুলঅলা বাচ্চা ফুল নিয়ে 'স্যার একটা লন', 'একটা লন' করছে। একজন দেখা গেলো স্পেশাল টাইপ ভিক্ষুক। সে বলছে, 'দে, দুইটাকা দে।'

মোহনের সামনে এসে বললো, 'দে, দুই টাকা দে'। মোহন মানিব্যাগ খোঁজার জন্যে পেছনের পকেট খুঁজছে।

লোকটা বললো, 'টাকা লাগবে না, একটা অটোগ্রাফ দে। তোর কাছে কাগজ নাই? কলম দিয়া সই কর।'

মোহন হেসে বললো, 'আমার কাছে কাগজ নেই যে।'

লোকটা তখন বুক পকেট থেকে একটা ময়লা ভাঁজ করা কাগজ বের করে বললো, 'এইটায় দে।'

মোহন অটোগ্রাফ দিলো। ফারুকের দিকে তাকিয়ে সে আত্মপ্রসাদময় একটা হাসি হাসলো। ফারুক আপন মনে বললো, সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর মরে!

অপিকে নামিয়ে দিয়ে আসার পর থেকে ফারুকের মনটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গেছে। কিন্তু সমস্যাটা কোথায়— সে ধরতে পারছে না। রাত্রিবেলা বাসায় ফিরলো তাড়াতাড়ি, দুটো জমজ ভাগ্নে আছে, আট বছর বয়সী, ওদের সঙ্গে গল্প-গুজব করার লোভে।

আজকালকার ছেলেপুলে, খুবই স্মার্ট। ওদের গল্পের বিষয়ও খুব অন্যরকম।

শাদ বললো, 'মামা, উম্মাদ আনো নি।'

ফারুক বললো, 'না তো। কাল কিনে আনব ঠিক।'

রাদ বললো, 'মামা, উম্মাদ নাকি তোমাদের আর্কিটেক্চার থেকে প্রথম বের হয়েছিল কথা কি ঠিক!'

ফারুক বললো, 'হতে পারে। আমি ঠিক জানি না।'

শাদ বললো, 'মামা, কালকে স্টেডিয়াম নিয়ে যাবে।'

রাদ বললো, 'মামা, না বলো না, না বলো না।'

ফারুক বললো, 'কেন, কালকে স্টেডিয়ামে কী হবে।'

শাদ-রাদ এক সঙ্গে বলে উঠলো, 'জাভেদ মিয়াঁদাদ আর ওয়াসিম আকরাম খেলতে এসেছে তো। আবাহনীর হয়ে খেলবে।'

ফারুক বললো, 'তাই নাকি। কিন্তু মোহামেডান-আবাহনী তো খালি মারামারি করে। মারামারি বেধে গেলে কী করবো?'

সাদ বলল, 'আরে না, পুলিশ আছে না।'

ফারুক হেসে বললো, 'পুলিশ তো কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে গ্যালারিতে। সেটা আরো বড়ো বিপদ।'

রাদ বললো, 'পুলিশ তো আবাহনী। নীল রঙের জার্সি।'

www.shopnil.com

শাদ বললো, 'কখনো না। আবাহনী জার্সির রং বদলেছে।'

ব্যাস দুইভাইয়ের লেগে গেলো ঝগড়া।

অন্যদিন হলে শাদ-রাদের সঙ্গেই অনেক রাত খেলতো ফারুক। নয় তো বসে বসে কাগজ কেটে বাচ্চা দুটোকে ঘরদোর জাহাজ বানিয়ে দিতো। স্থাপত্যবিদ্যার সর্বোত্তম ব্যবহার। কিন্তু আজ কিছু ভালো লাগছে না।

নিজের ঘরে এসে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো। ঘুম আসছে না।

বুবু এসে বললেন, কী ফারুক, খাবি না!

'না, খেয়ে এসেছি।'

'তবু খা। অল্প করে খা।'

এইটিই তার একমাত্র বোন। বড়ো বোন।

নেহলিন আব্দুল্লাহ। হাজবেন্ড ডাক্তার। বাবার ছাত্র ছিল। সুপাত্র পেয়ে বাবা মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। বিয়ের পর এক সঙ্গে দুটো বাচ্চা নিয়ে বুবু সংসারী হয়ে পড়েছে। অথচ আগে খুব ভালো অ্যাথলিট ছিল। স্কুল পর্যায়ে দৌড়ে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। লম্বা সুন্দর ফিগার ছিল। এখন কতো মোটা। কাবুলিওয়ালা হয়ে গেছে। একমাত্র ভাইটিকে নিয়ে তার অনেক গর্ব। কী যে আদর করে তাকে!

প্লেটে করে ভাত নিয়ে বুবু হাজির। 'নে ফারুক ভাত খা। হাত ধো।'

'না বুবু।'

'চামচ এনে দেবো। চামচ দিয়ে খাবি!'

'নাহ।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। আমি খাইয়ে দিচ্ছি।'

ফারুকের মনে হলো, একটা বড়ো করে ধমক দেয়। কিন্তু কোনো মানে হয় না। এই মেয়েটি তাকে আদর করে আনন্দ পায়। তাকে বঞ্চিত করার দরকার কী! ফারুক বললো, 'দাও। এক লোকমা। বেশি দিতে পারবে না।'

এক লোকমা খাইয়ে বুবু বললেন, 'মাত্র একবার খেয়ে হয় না। নে, আরেক লোকমা নে।'

বোনটি তার চেয়ে তিন বছরের বড়ো। কিন্তু তাকে মানুষ করেছে, বলা যায়, সেই। মায়ের কী একটা অসুখ হয়েছিল।

সারাক্ষণ বিছানায় পড়ে থাকতো। এই মেয়ে ছোটো ভাইটাকে ভাত তুলে তুলে খাওয়াতো। পিঠ রগড়ে গোসল করাতো।

বুবু সেই ছোটোবেলার মতো করছে। ভাত মেখে ছোটো ছোটো লোকমা বানাচ্ছে। তারপর প্লেটে সাজিয়ে রাখছে।

'নে, এটা রাদের ভাগ। এটা খা।'

ফারুক খেলো।

'নে, এই দলাটা সাদের। এক ভাগ্নেরটা খেলে তো অন্যেরটাও খেতে হবে।'

বুবু বললেন, 'তোর কি মনটা খারাপ?'

'কেন?'

'তোকে খুব অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে।'

'আমি তো সব সময়ই অন্যমনস্ক।'

'তাহলেও। আজ বেশি দেখাচ্ছে।'

হতে পারে। ফারুক ঠিক জানে না, আজ তার কী হয়েছে।

সারাটা রাত চুপ করে শুয়ে রইল সে। বাতি নিভিয়ে। জানালা খুলে।

একা একা আপনমনে পড়ে চলল শক্তির কবিতাগুলো। যতোটা মুখস্থ আছে।

তারপর ক্যাসেট প্লেয়ারে শচীদেব বর্মণের গান ছেড়ে দিলো। কে যাস যাস রে, ভাটি গাঙ বাইয়া, আমার ভাইজানরে বইলো নাইয়োর নিতো আইয়া। তার মনে হলো, কোন সুদূর ভাটির দেশে, কোনো নির্জন নদীতীরে এক নারী দাঁড়িয়ে, তার একটা হাত গাছের কাণ্ডে, উদাস দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে নদীর দিকে, পাল তুলে নৌকা চলেছে, দূর থেকে কালো ছায়ার মতো তার মাঝিকে দেখা যায় কি যায় না, তার ধূ ধূ অন্তরজুড়ে ফিরে ফিরে আসছে বাবার বাড়ির স্মৃতি, শৈশব, আর তার নাকে সর্দি গলায় মাদুলি কোমরে ঘুঙুর ছোট ভাইটি, সে এখন কতো বড়ো হয়েছে— সেই সব, সেই সব! হায়, আর কোনোদিন সে ফিরে পাবে না তার শৈশব, ফিরে যেতে পারবে কি পারবে না উজানদেশে তার পৈতৃক বাড়িটিতে। কতোদিন হয়ে গেছে, বাড়ির কোনো খবর নেই। তার অন্তর কেঁদে চলেছে, কিন্তু চোখে অশ্রুর দাগ নেই, বোবা কান্না বুকের ভেতর গুমড়ে গুমড়ে মরছে।

অপির কথা মনে পড়লো তার, মেয়েটার সঙ্গে তার প্রথম দেখার কথাও আজ মনে পড়ে যাচ্ছে, সে বুয়েট শহীদ মিনারের সামনে চায়ের দোকানে চা খাচ্ছিল, আর্কিটেকচার বিল্ডিং কোথায় মেয়েটি তার কাছে জানতে চেয়েছিল, সে একনজর মেয়েটিকে দেখেই ভেতরে ভেতরে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল, তার ভেতরে লাফিয়ে উঠেছিল কাঠবিড়ালীর চারা, কিন্তু মেয়েটি মানে জানে না, তখন মনে হয়েছিল, কোনোদিন জানবেও না। সে একটা আত্মভোলো মানুষ। একটা রূপবতী তরুণীকে দেখে সে মুগ্ধ হয়, ফিরে তাকায়, কিন্তু মাত্র একবার, তার বেশি তো নয়। কতোদিন পর তারই সঙ্গে, একই রিকশায়।

তার এই ন্যালা-খ্যাপা হাবাগোবা ভালোমানুষির জন্যেই বোধহয়, মেয়েরা তাকে খুব মমতা দেখায়। তার বুবু তাকে ভাত তুলে খাওয়ায়। ক্লাসের মেয়েরা, বিশেষ করে তানিয়া, বো হয় মায়ের প্রতিবন্ধী শিশুটির মতোই তাকে দেখতো, তার জন্যে বোধহয় তার খুব মায়াই হতো। চুলকাটা বাজে হলে সে চেঁচাতো, ক্লাসের অ্যাসাইনমেন্ট প্রায়ই করা হতো না ফারুকের, তখন তানিয়া তার ড্রয়িংশিট নিয়ে যেতো, তার জন্য সহপাঠিনীরা মিলে রাত জেগে তার হয়ে কাজ করতো, তারা বলতো কামলা খাটা।

তানিয়া যেদিন অ্যামেরিকা চলে যাচ্ছে, তার আগেরদিন তাদের বাসায় ফারুককে ডেকে নিয়েছিল, বলেছিল, হলে থাকিস, কী খাস না খাস, যাহ, তোর জন্যে ওয়ানটাইম রেজর শেভিং ক্রিম কিনে এনেছি, শেভ করে গোসল করে আয়। মেয়েদের এইসব মধুর অত্যাচার ফারুক উপভোগই করে। বলেছিল, 'দে, গালে মনে হয় উকুন হয়েছে।'

গোসল করে শেভ করে তানিয়ার দেয়া নতুন পাজামা-পাঞ্জাবি পরে সে খেতে বসেছিল।

www.shopnil.com

তানিয়া ডাইনিং টেবিলে তাকে তুলে তুলে যত্ন করে খাইয়েছিল। বলেছিল, 'মাছ খা।' একটা মস্ত বড়ো পেটি তুলে দিয়েছিল পাতে।

'উহু দিস না। কাঁটা বেছে খেতে পারি না।'

কথা সত্য। যতোদিন রংপুরে ছিল, বুবুর যতোদিন বিয়ে হয়নি, বুবু তার মাছের কাঁটা বেছে দিয়েছে।

তানিয়া নিজেই কি ভালো কাঁটা বাছতে পারে। তবু যত্ন করে বেছেছিল। সেই মাছ খেতে গিয়ে গলায় আটকে গিয়েছিল কাঁটা। তানিয়াকে লজ্জা দেবার ইচ্ছা ছিলো না, কিন্তু গলায় কাঁটা বিঁধলে চুপচাপ খেয়ে যাওয়া মুশকিল। তানিয়া বলেছিলেন, নে এই শাদাভাতের দলাটা খা। কাঁটা যাবে।

কী চক্রাকারে পৃথিবী চলেছে। বুবু ঠিক একইভাবে বলতো।

পরদিন তানিয়া অ্যামেরিকা চলে গেলো। খুব করে বলেছিল, ফারুক চিঠি দিস। তোর মুখ দেখে মনে হচ্ছে, চিঠি দিবি না।

না। কোনোদিন তাকে চিঠি লেখেনি ফারুক। তানিয়া লিখেছিল প্রথম দিকে। এখন, শুনতে পায়, তার দুটো বাচ্চা হয়েছে। সে ভালো আছে।

কে যাস রে, ভাটির গাঙ বাইয়া, আমার ভাইজানরে বইলো নাইয়োর নিতো আইয়া। পরাণ আমার কেমন কেমন করে। ভাইয়ের দেখা পাইলাম না পাইলাম না। পৃথিবীতে যতো বোন আছে, তারা যেন সবাই ভালো থাকে। সুখে থাকে।

ফারুকের চোখ ভিজে আসছে। আজ মনটা সত্যি দুর্বল হয়ে আছে। বিক্ষিপ্ত।

মেয়েদের সঙ্গে তার সম্পর্কটা হয়েছে এমনি মমতাপূর্ণ, প্রশ্রয়পূর্ণ, কিন্তু যাকে বলে প্রেমে পড়া, তার কোনো পূর্বঅভিজ্ঞতা তার নেই। কিন্তু অপি মেয়েটার জন্য তার এমন লাগছে কেন? কেন মনে হচ্ছে, ওর কাছে গেলে, দু দণ্ড ওর পাশে বসলে, ওর সঙ্গে গল্প করলে তার ভালো লাগবে। মেয়েটার প্রসঙ্গ যতো ভাবছে, ততো তার ভালো লাগছে, মনে হচ্ছে, সব কিছু বাদ দিয়ে সারাক্ষণ শুধু অপির কথাই ভাবি। দুইদিন চলে গেলো। মনের বিক্ষিপ্ত ভাবটা তার গেলো না। বারবার ভেতর থেকে প্ররোচনা আসছে, যাও ওয়ারির পাচিলঘেরা গাছগাছালি ছাওয়া ওই দোতলা বাড়িটায় যাও। কিন্তু তা কী করে হয়? এক তরুণীর বাড়িতে একটা উটকো লোক হাজির হলে বাড়ির সবাই কী ভাববেন? মেয়েটাই বা কী ভাববে! না না, এটা সম্ভব নয়। তা ছাড়া তার নিশ্চয়ই কারো সঙ্গে সম্পর্ক আছে। আজকালকার মেয়ে কি এতোটা বয়স পর্যন্ত একা থাকে? এরা তাদের পরের জেনারেশনের মেয়ে। হটহাটে গিয়ে হটডগ খায়। টেবিলে ফোন নম্বর লিখে রাখে। না, পাগলামি করা উচিত হবে না। একটা অজানা অচেনা পরিসরে সে ঝোড়ো হাওয়ার মতো ঢুকে পড়ে সব কিছুকে নাড়িয়ে চাড়িয়ে এলোমেলো করে তুলতে পারে না।

আছে শুধু প্রাণ বাকি তাও বুঝি যায় সখি
কি করব কহবি উপায়।
শ্যামানন্দ দাসে কয় শ্যাম ত ছাড়িবার নয়
পার যদি ধর গিয়া পায়॥

ক্লাস ছিল সকাল ৮টায়। অপির ক্লাসে মন বসছে না। সে উশখুশ করছে। তার দরকার সাব্বিরকে। স্যার প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র পড়াচ্ছেন। পেছন থেকে এক ফাজিল ছাত্র বললো, 'প্লেটোনিক লাভ আর প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র কি এক জিনিস স্যার।'

'তুমি বসো।'

'জি স্যার বসছি। একই, তাই না স্যার।'

'এক না।'

' তাহলে প্লেটোনিক লাভ জিনিসটা কী স্যার?'

'উইল ইউ সিট ডাউন। ডোন্ট ট্রাই টু বি ওভার স্মার্ট।' স্যার চিৎকার করে উঠলেন। ক্লাস মুহূর্তে থমথমে হয়ে পড়লো। স্যারের চোখেমুখে রক্ত উঠে গেছে, মুখমণ্ডল লাল।

অপি খাতায় নোট নিচ্ছে, অন্যমনস্কভাবে, খাতাভরা হিজিবিজি দাগ, সে বড়ো বড়ো অক্ষরে লিখে রাখলো— প্লেটোনিক লাভ। ক্লাস শেষে নব্বির এলো অপির কাছে। বললো, 'ইস, প্লেটোনিক লাভ জানা গেলে না জিজ্ঞেস করা যেতো সক্রেটিক লাভ কী? তারপরেই তো আসতো ফ্রয়েডিয়ান লাভে। হা হা হা।'

'এই নব্বির, সাব্বির কোথায় রে?'

নব্বির আবার হাসলো, রহস্য করে বললো, 'একজন বীর যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর আগমন দেখলে যা করেছে, সাব্বিরও তাই করেছে।'

'সাব্বির কোথায় বল না। খুব দরকার।'

'সাব্বির খোঁড়া খাদেম গ্রুপের ভয়ে দেশের বাড়ি চলে গেছে। ওদের অনুষ্ঠান নিয়ে তো বিশাল গণ্ডগোল।' খোঁড়া খাদেম হলো জনৈক ক্যাডার-সর্দার।

'কবে আসবে?'

'মনে হয় আসবে না। খোঁড়া খাদেম অ্যারেস্ট ট্যারেস্ট হলে ভিন্ন কথা।'

'আচ্ছা তুই কি ফারুক আবদুল্লাহর ঠিকানা জানিস।'

'ফারুক আবদুল্লাহ কে?'

'ওই যে সেদিন অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করলো?'

'নাহ। এসব পাখিসব করে রব কাউয়ার ঠিকানা আমি রাখিটাখি না।'

www.shopnil.com

'মুশকিল হলো তো।'

কিন্তু সে যে করেই হোক, ফারুককে খুঁজে বের করবেই। এই এখন তার একমাত্র পণ। বোকাট্টা ঘুড্ডির পেছনে ধাবমান ছেলের দল যেমন আর কিছুই দেখে না, পথপ্রান্তর ঝোঁপঝাড় খাল নর্দমা জুড়িগাড়ি তুচ্ছ করে ছুটতে থাকে ওই একটাকার ঘুড্ডির পেছনেই, পা কেটে যায়, নখ ছেচে যায়, কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয় কেউবা, ছাদ থেকে পড়ে যায় কেউ, গাড়িচাপাও পড়তে পারে— এ হলো তেমনি দশা। সে আর কিছুই বোঝে না এখন, শুধু ফারুক আবদুল্লাহকে খুঁজে বের করা তার চাইই। ন্যায়-অন্যায় বুঝিনে বুঝিনে বুঝিনে, শুধু তোমারে জানি অবস্থা।

সেকি বুয়েটে যাবে? কোনো মানে হয় না। একবছর আগে যে পাস করে গেছে, তার খোঁজ কোথায় পাওয়া যাবে? আজ এই ইউনিভার্সিটি এসে যদি কেউ অপির খোঁজ করতে শুরু করে, তাহলেই পাবে কিনা, সন্দেহ। তাহলে?

একটা উপায় আছে। শব্দযোগ-শব্দভেদ কোন্ কোন পত্রিকায় ছাপা হয়, তা বের করা। কলাভবনেই পত্রিকার স্টল আছে, ফটোকপিয়ার মেশিনের দোকানে। অপি বললো, 'নব্বির, আমার সঙ্গে একটু আয় তো।'

পাঁচটা সাপ্তাহিক ও তিনটা দৈনিক পত্রিকায় ওয়ার্ড পাজল ছাপা হয়। সে প্রতিটা পত্রিকার টেলিফোন নম্বর টুকে নিলো। তারপর সোজা গিয়ে উঠলো রিকশায়, এই রিকশা, ওয়ারি চলেন। নব্বির অবাক হয়ে গেলো। পাশে যে সে আছে, কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। ব্যাপার কী? নব্বির বললো, 'কী রে অপি, কাজের বেলা কাজী কাজ ফুরোলে পাজি। ব্যাপার কী?'

অপি অসহায় ভঙ্গিতে তাকালো নব্বিরের দিকে।

'দে একটা বেনসনের দাম দিয়ে যা।'

বাসায় গিয়েই অপি লেগে পড়লো টেলিফোন করতে। হ্যালো, এটা অমুক পত্রিকার অফিস। আচ্ছা, আপনাদের শব্দজব্দ বিভাগটা কে দেখেন বলেন তো। আছেন তিনি? একটু কথা বলা যাবে। কোনো পত্রিকার শব্দজব্দ সম্পাদক উপস্থিত আছেন, কোনোটার নেই।

আধঘণ্টা চেষ্টার পর জানা গেলো সাপ্তাহিক যুগান্তর পত্রিকার এ বিভাগটিতে ফারুক আবদুল্লাহ কনট্রিবিউট করেন।

'হ্যালো,' অপি বললো যুগান্তরের শব্দজব্দ বিভাগের সম্পাদককে, 'ফারুক আবদুল্লাহর টেলিফোন নম্বরটা কি দেবেন? আমার খুব দরকার।'

'আপনি ওনার কে হন?'

'কেউ হই না। কিন্তু ওনাকে আমার দরকার।'

'কী দরকার, বলা যাবে?'

'না। বলা যাবে না। উনিই বুঝবেন।'

'না, নম্বর তো দেওয়া যাবে না।'

'কেন যাবে না, জানতে পারি?'

'জি। আসলে বাজারে অনেক পত্রপত্রিকা। খুবই প্রতিযোগিতা। এখন ওনার নম্বর প্রায়ই

চায় বিভিন্ন পত্রিকা। আমরা দেই না। এই হলো ব্যাপার।'

'না না। আমি কোনো পত্রপত্রিকা থেকে বলছি না। আমার পারসোনাল দরকার।'

'ঠিক আছে। আপনার কোনো মেসেজ থাকলে জানাতে পারেন। উনি এলে আমি পৌঁছে দেবো।'

'আচ্ছা বলবেন, ওয়ারি থেকে অপি ফোন করেছিল?'

'কে ফোন করেছিল?'

'অপি। স্বর অ, প-য়ে হ্রস্ব ইকার। অপরাজিতা হক। উনি যেন আমাদের বাসায় আসেন। খুব দরকার। আর আমার ফোন নম্বরটা হলো—

সারাদিন কেটে গেলো প্রতীক্ষায়। এই বুঝি টেলিফোন বেজে উঠলো। বৃষ্টির ফোঁটাকে মনে হয় তার পায়ের শব্দ, পাতার শব্দকে মন হয় গাড়ির আওয়াজ, চক্ষু কান ইন্দ্রিয় সব সজাগ, অতন্দ্র খাড়া— কিন্তু সে আসে না, কে জানে তার আসতে কতো হাজার বছর লাগবে।

পরদিন আবার ফোন নিয়ে বসলো অপি। *প্রতিদিন* পত্রিকার সঙ্গে কথা বলে জানা গেলো, ওখানেও যায় ফারুক। তারা ফোন নম্বর দিতে পারলো না। কারণ যার কাছে ফোন নম্বর আছে, তিনি নেই।

'তিনি কখন আসবেন?'

'আপনে সকাল ১১টার দিকে ফোন কইরেন।'

তাহলে আবার কাল সকাল ১১টায়।

সে আসছে না, কিন্তু আশা জাগছে। সামনে করণীয় কী, সেটা জানা থাকছে। হ্যাঁ। সময় কেটে যাবে, যাচ্ছে তো। একেকটা মুহূর্ত যেন একেকটা বছর, চলে যাচ্ছে।

ফারুক আবদুল্লাহর তখন সব কিছু অসহ্য হয়ে উঠেছে। পাখির জুলুম মেঘের জুলুম খারাপ লাগছে, চাঁদ দেখতে খারাপ লাগছে, হাসিখুশি সুখী মানুষ খারাপ লাগছে, মন কেবল পদ যুগলকে প্ররোচিত করছে ওয়ারি ওয়ারি বলে— ধুত্তুরি ছাই বলে কাঁধে একটা ব্যাগ ফেলে সে বেরিয়ে গেলো। সোজা গেলো চট্টগ্রাম বাসস্ট্যান্ডে, উঠে পড়লো কক্সবাজারগামী এক নাইটকোচে। না। হৃদয়ের দুর্বলতাকে জয় করতে হবে। একটা মেয়ে তার জন্যে মমতা দেখিয়েছে, সেটাতো প্রেম নাও হতে পারে। সে প্রেমের উদ্দেশ্য নিয়ে তার বাড়ি গিয়ে হাজির হতে পারে না।

পরদিন সকাল ১১টায় ফারুক আবদুল্লাহর বাসার টেলিফোন নম্বর যোগাড় করে ফেললো অপি। ফোন নম্বরের প্রতিটা ডিজিট তার রক্তের কণায় কণায় কাঁপন ধরালো। তার সমস্ত শরীর এতো কাঁপছে কেন। কাঁপতে কাঁপতেই ডায়াল করলো সে ফারুকের নম্বরে।

ফোন ধরলেন এক নারীকণ্ঠ।

'হ্যালো, ফারুক আবদুল্লাহ আছেন?'

'না, বাসায় নেই।'

'কখন আসবেন?'

www.shopnil.com

'সেটাতো বলতে পারছি না। ও তো কাউকে কিছু না বলে গত সন্ধ্যায় বেরিয়ে গেছে। শুধু একটা চিরকুট রেখে গেছে— আমি একটু ঢাকার বাইরে যাচ্ছি। বেশ কিছু দিন হয় তো থাকব। চিন্তা করো না।'

অপি গভীর হতাশার মধ্যে নিমজ্জিত হলো, মনে হলো, একটা আকাশ কেউ নিভিয়ে দিলো বুঁজিয়ে দিলো এক ফুঁয়ে।

বুকের কাঁপুনি একটু কমলে ওপাশ থেকে ভেসে এলো, 'আমি ওর বোন। আপনি কে বলছেন?'

'আমার নাম, আমার নাম..... ?

অপি নাম খুঁজে না পেয়ে ফোন দিলো রেখে।

আমি মরি মর্মযাতনায়, আর উনি ঢাকার বাইরে গেছেন, পর্যটনে বেরিয়েছেন। আবার সেই লোনা ঈষদুষ্ণ জলফোঁটা, আকাশ ছাপিয়ে অসেছে,— আবার।

ফারুক যখন কক্সবাজারে পৌছেছে, তখন সকাল ন'টা। রাতের জার্নি, ফারুকের এ-জীবনে কম করা হয় নি, প্রায়ই সে আগে ঢাকা-রংপুর করতো। কক্সবাজারে সে এলো এই প্রথম, বাসস্ট্যান্ড থেকে সোজা সে গেলো সাগর পাড়ে।

শরৎকালের সকাল, আলোয় ঝামা ইটের মতো ঝাঁজ, সৈকতে চিকচিক করছে বালি, মানুষ থৈ থৈ করছে এখনি। কাঁধে ব্যাগ, সমুদ্রে এখন জোয়ার, ফারুক সোজা চলে গেলো সমুদ্রের কাছে, তরঙ্গের পর তরঙ্গ এসে তার পা ভিজিয়ে দিতে লাগলো। এই সেই সমুদ্র তা হলে! সিনেমায় বহুবার দেখা, বাংলা সিনেমা ও বিটিভি নাটকের বহু ঘটনার উৎসস্থল।

সে সৈকতে বসে পড়লো, এখানে ওখানে আরো নানা লোকজন, কেউবা বসে আছে ছাতার নিচে, কেউবা নেমে গেছে স্নান করবে বলে, লোকজনের হাতে ক্যামেরা, পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি তোলা ছবি বোধহয় এই সমুদ্রই।

জোয়ার গেলো, ভাটার সময় এলো, সমুদ্রতীর ফাঁকা হতে শুরু করেছে, স্নানার্থীরা ফিরে গেছে, দুপুরবেলার খাওয়ার টানে ফিরে যাচ্ছে পর্যটকেরা, সমুদ্র সরে যাচ্ছে, কিন্তু ফারুক যাবে কোথায়। দুপুর ঝাঁঝানো বালি, পায়ে ফোস্কা পড়ার যোগাড়, ফারুক সমুদ্র সৈকত ধরে হাঁটছে। সাঁই সাঁই বাতাস, ঢেউয়ের পরে ঢেউ, ফেনায়িত শাদা, উপরে নির্মেঘ আকাশ, আর তার মাথার উপরে দুধশাদা গাঙচিল। এরাই নিশ্চয় শঙ্খচিল।

আর তখনই মনে পড়ে গেলো জীবনানন্দের সেই কবিতাখানি, হায় চিল সোনালি ডানার চিল এই ভিজে মেঘের দুপুরে, তুমি আর কেদোঁ নাকো উড়ে উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে! তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে! সে বসে পড়লো সমুদ্রতীরে, একা, ঝাউগাছের নিচে।

উপরে অসীম আকাশ, সামনে নিঃসীম সমুদ্র, তীরে আমি একা। এ বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে এই মহাশূন্যতার মাঝে সামান্য অস্তিত্ব নিয়ে একটা খুদের মতো আমি একা।

'স্যার, বিয়ার লইবেন স্যার।' একটা লুঙ্গিপরা লোক, তাকে ঠিকই যথাস্থানে যথাসময়ে

শনাক্ত করে ফেলেছে।

'দাও।'

না। ফারুক আবদুল্লাহ এসবে কোনো দিন মজা পেয়েছে, তা কিন্তু নয়। বিয়ার তো তার খুবই তিতা লাগতো, সে বলতো পাটপাতা পচা পানি। কিন্তু আজ সে কী করবে? একটা কিছু তো করা দরকার।

রাতের বেলায়ও সে সৈকতে বসে রইলো অনেকক্ষণ। রাতের সমুদ্রই বেশি দর্শনীয়, ঢেউয়ের মাথায় জ্বলে ফসফরাস, ফ্লুরোসেন্ট লাইটের মতো, শাদা ফেনাকে রাতের আঁধারে অপূর্ব মায়াময় এক মেয়ে, সার্কাসের তারের উপরে নাচছে বলে মনে হলো।

রাত কাটলো সস্তা হোটেলে। কোনোমতে।

ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেলো।

সে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে পৌছলো সমুদ্রতীরে। সমুদ্রে সূর্যোদয়দর্শী মানুষজন আসছে। একটু পর সূর্য উঠবে, তার আবাহনের জন্যে পূর্বদিগন্ত প্রস্তুত। সে চোখ বন্ধ করলো। এই দৃশ্য তার একা দেখা উচিত নয়। এই দৃশ্যে আরো একজনের অংশভাগ আছে। তার নাম অপরাজিতা হক। অপি।

হোটেলে দু'দিনের অগ্রিম টাকা দেওয়া আছে। সে তাড়াতাড়ি একটা রিকশায় উঠলো চলো বাসস্ট্যান্ডে। ঢাকাগামী সরাসরি বাসটা আরো আধঘণ্টা পর ছাড়বে। পেছনের দিকে সিটও ফাঁকা আছে। সে টিকেট করে বাসে চড়ে বসলো।

বাসের মধ্যে গান বাজতে লাগলো, হিন্দিগান, কভি কভি মেরা দিল মে....., মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, কে যেন তোমাকে ওই আকাশে গেঁথে রেখেছে, আমার জন্যে।

সন্ধ্যার সময় ঢাকায় পৌছলো বাস। চুল উশকো খুশকো, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখ রক্তজবা— ফারুক সোজা হাজির হলো হাসিবাড়িতে। নিচতলার ভাড়াটে জানালো অপিরা থাকে দোতলায়— সে দোতলায় উঠলো, প্রতিটা সিঁড়ি মেপে মেপে, কিন্তু কী এক ঘোরের মধ্যে— দরজায় কলিংবেল, টিপলো।

দরজা খোলার জন্যে, দৌড়ে এলো অপি, খুললো— আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে ফারুক, সেই যে বুয়েটে প্রথম সাক্ষাতের সময়কার চেহারা নিয়ে— একি সত্য, একি সত্য!

চোখ ধাতস্থ হচ্ছে অপির, বাইরে সূর্য ডুবে গেছে, লাল আভা এখনো লেগে আছে মেঘে, দোতলার গেটে তেরসা স্বর্ণালী আলো এসে পড়েছে, সোনালি এক মৎস্যযুবকের মতো দাঁড়িয়ে আছে ফারুক।

'কী, ভেতরে যেতে বলবে না?'

'হ্যাঁ। আসেন। ইস্। আপনাকে খুঁজে পেতে কতো কষ্ট করতে হয়েছে আপনি জানেন। কে খবর দিলো আপনাকে। যুগান্তর পত্রিকা।'

'কী খবর!'

'যে, আমি আপনাকে খুঁজছি। খুব দরকার।'

'নাহ। আমি কক্সবাজার চলে গিয়েছিলাম। ওখানে থেকে আসছি। বাস তো এদিক দিয়েই যায়। ভাবলাম, যাই অপির বাসা হয়ে, দেখি বাসায় আছে কিনা।'

www.shopnil.com

রূপ দেখি কেবা যাইব ঘরে
চিত্ত-কাড়া কালার বাঁশী লাগিছে অন্তরে

'কে এসেছিল রে'— দাদি বললেন।

'এসেছিল একজন'— অপি বললো।

'একজন? দুই তিনজন নয়? তাহলে চিন্তার কথা। তা একজনটা কে?'

'তাতো বলা যাবে না দাদি।'

'ও বুঝতে পেরেছি। তা আমার সঙ্গে পরিচয় করে দিলি না?'

'মাথা খারাপ। তোমার যা রূপ। ওর চোখটা ধাঁধিয়ে যাক, মাথাটা বিগড়ে যাক। অতো বোকা আমি নই। আমার চেয়ে রূপবতী কারোর সঙ্গে আমি ওর পরিচয় করিয়ে জীবনেও দেবো না।'

দাদি হাসলেন। 'নারে বুবু, তোর মানুষের মাথা খেতে পারি, এমন রূপ কি আর আমার আছে। মাথাটা তুইই খা। আমাকে লেজ, না হলে পেটি দিস। হি হি হি।'

অপি হাসতে লাগলো। দাদিকে জড়িয়ে। কী যে মনখোলা দিলখোলা হাসি। হাসিবাড়ির বিখ্যাত পেটেন্ট করা হাসি।

'দাদি। আজ কিন্তু চুলে তেল দিয়ে টান করে বেঁধে দেবে। কাল শ্যাম্পু করবো।'

'রাতের বেলা তেল দিবি?'

'তা না হলে তো উপায় নেই। দাঁড়াও আগে একটা ফোন করে আসি।'

'এক্ষুনি না বেরুলো। আবার এখনি ফোন।'

'এক্ষুনি না মাথা। সেই কখন বেরিয়েছে, এতোক্ষণে নিশ্চয় পৌঁছে গেছে।'

প্রেমে পড়লে পুরুষ হয় বোকা আর নারী হয় সাহসী। অপি ফোন করতে গেলো। এখনি তার কথা বলা চাই। চাই-ই।

'হ্যালো। ফারুক আবদুল্লাহ আছেন?'

'জিনা। উনি ঢাকার বাইরে।'

ঝুপ করে ফোন রেখে দিলো অপি, ১৫ মিনিট পরে আবার।

'হ্যালো, ফারুক ভাই আছেন?'

'জি, এই মাত্র এসেছে। ধরুন। এই ফারুক, ফারুক, তোর ফোন।'..

'হ্যালো।'

'ফারুক ভাই, এতোক্ষণ লাগলো বাসায় পৌঁছতে।'

'এই তো এলাম। জ্যামে পড়ে গিয়েছিলাম।'

'আর আমি চিন্তায় চিন্তায় কাহিল। আবার লোকটা অন্য কোথাও চলে গেলো নাকি? গারো পাহাড়ে টাহাড়ে।'

'যাব যাব। এবার একা যাব না। সঙ্গে দোকা নিয়ে যাব।'

'দোকা' কাকে?'

'আছে। আমারও এখন নিয়ে যাবার মতো মানুষ আছে।'

অপির বুক ঢিপঢিপ করছে। কার কথা বলছে। অন্য কারো কথা নয় তো!

'সেই মানুষটা আবার কে?' আগে বলেন নি তো!'

'আগে ছিল না তো। তাই বলি নি। এখন হয়েছে, তাই বলছি।'

'গারো পাহাড়ে গিয়ে কী হবে?'

'সূর্যোদয় দেখবো।'

'ইমা। ব্যাপারটা কেমন আটআনার ভিউকার্ড হয়ে যাবে না?'

'শোনো অপি। পৃথিবীর কিছু কিছু দৃশ্য আছে যা খুব পুরোনো, কিন্তু পুরোনো হয় না। চিন্তা করে দেখো, গাঢ় সবুজ মাটির পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে কালো-সবুজ বন, দিগন্তে শুধুই পাহাড়ের রেখা, দূরে পাহাড় আবছা হয়ে মিশে গেছে আকাশের সঙ্গে, ভোর হচ্ছে, একটা ছোট্টো লাল সূর্য, লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে রাবারের লাল বলের মতো, আর সমতলে দাঁড়িয়ে দুটো মানব-মানবী, ঘাসের গায়ে শিশির, মেয়েটা ছেলেটার হাত আলতো করে ধরে আছে, নির্জন পাহাড়ের কোলে তারা সূর্যোদয় দেখছে, সূর্যের প্রথম আলো পড়লো তাদের চোখে মুখে চুলে,.....'

এই প্রথম তাদের ফোনে কথা হচ্ছে। ফোনে ফারুকের কণ্ঠস্বর আরো সুন্দর। ভয়াবহ। ফারুক ভাই, ফোনে কিন্তু আপনি অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না, মনে মনে বললো অপি। মুখে বললো, 'আমি যাবো। আমি যাবো। পাহাড়ে সূর্য ওঠা দেখতে আমাকে নিয়ে যেতে হবে। বলেন, যাবেন, বলেন.....'

'যাব। নিশ্চয় যাব।'

'লক্ষ্মী ছেলে ...।'

'তোমার ছেলে আসলেই লক্ষ্মী। জানো, আজ ভোরে আমি কেন কক্সবাজার ছাড়লাম! রাতে ঘুম হচ্ছিল না। ভোরে গেছি সমুদ্রের ধারে। দেখি, কতো কতো লোক আসছে। সূর্যের ওঠা দেখবে বলে। আমার মনে হলো, এ এক শাশ্বত দৃশ্য। এ একা আমার দেখা উচিত নয়। আমি মুখ ঘুরিয়ে চোখ বন্ধ করলাম। সূর্যকে বললাম, অপেক্ষা করো, আমি আবার আসব, সঙ্গে একজনকে নিয়ে আসব তারপর দেখব দুজনে। আমার মন যে আরেকজনের কাছে পড়ে আছে। এমন মনহীন চোখ নিয়ে আমি, সূর্য, তোমাকে দেখতে পারি না।

আমি সোজা ঢাকার বাসে উঠে বসেছি। তারপর.....

'তারপর?'

'সোজা তোমার কাছে।'

www.shopnil.com

'এই, আমার চিঠি পড়েছেন?'

'না। খুব মন দিয়ে পড়বো। ঘরের দরজা বন্ধ করে....'

'ইস। আপনাকে এখন খুব দেখতে ইচ্ছা করছে। আপনার একটা ভালো ছবি আমাকে দেবেন তো। আর শোনেন, আমাকে কিন্তু চিঠি লিখবেন। বড়ো বড়ো চিঠি।'

'বারে। কথাই তো হচ্ছে।'

'হোক। কিন্তু চিঠি হলো পাহাড়ে সমুদ্রে সূর্যোদয়ের মতো। ওটা কখনো পুরোনো হয় না। কী, লিখবেন তো।'

'হুঁ'।

'এই তোর গরম পানি বাথরুমে দেয়া হয়েছে। যাহ! গোসল করতে ঢোক, পরে কথা বলিস। মেয়েটা কে রে?' বুবু চিৎকার করে বললেন ফারুককে।

'কে?'

'আমার বুবু। একমাত্র বোন। গোসল করতে বলছেন।'

'ইস আপনার চেহারার যা হাল হয়েছে। নিন বাবা, গোসল টোসল সেরে খেয়ে নিন। আজ রাখি তাহলে। কালকে সকালবেলা উঠেই ফোন করবেন। জান। জাদু....সোনা সোনা.....।

'অপি, অপু.....অপু সোনা। লক্ষ্মী.....'

'রাখেন।'

'তুমি রাখো।'

'তুমি রাখো।'

'রাখি। মা আসছেন।'

গোসল সেরে গরম গরম ভাত। ফারুকের দুচোখ ঘুমে কাদা হয়ে এলো— কতো ধকল গেছে দু'দিন। সে নিজ ঘরে গিয়ে বিছানায় পিঠ ঠেকিয়েছে মাত্র— অমনি ঢুকে গেলো ঘুমের অতলে। বাতি জ্বালানো ছিলো।

বুবু এসে বিছানা ঠিক করে দিলেন। বাতি নিভিয়ে দিলেন। রাদ ও শাদ এদিকে হামলা করতে চাইছিল, মা বললেন, না, মামাকে এখন ডিস্টার্ব করো না, বেচারা বড্ডো টায়ার্ড....

ঘুম ভাঙল শেষ রাতে। বেড সাইড ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে সে ধরফর করে উঠে পড়লো। অপির চিঠিটা কই?

চিঠি নিয়ে বিছানায় শুয়ে খামটা নাড়লো চাড়লো।

সম্বোধনহীন চিঠি, তুমি করে লেখা। দফায় দফায় লিখেছে, এক বৈঠকে নয়।

অপি লিখেছে—

আমাদের বাড়িটা হাসিবাড়ি। এ-বাড়ির সবাই খুব ভালো। হাসিখুশি। এ বাড়িতে কেউ কাঁদে না। আমার মনে হয়, নতুন কেউ জন্ম নিলেও নবজাতকের কান্না নয়, হাসি শোনা যাবে। এই বাড়িতে হঠাৎ একটা মেয়ে কাঁদছে। তার সমস্ত পাঁজর ভেঙে মুচড়ে বেরিয়ে আসছে কান্না আর কান্না। কাঁদতে যে তার বড়ো ভালো লাগছে।

দাদি বলেছেন, এ-রকম হয় শুধু প্রেমে পড়লে, ভালোবাসলে।

ভালোবাসা, আমি তোমার জন্যে কাঁদছি।

দাদি বলেছেন, এই কান্না কেঁদেও সুখ।

এই চিঠির গায়ে আমার ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল লেগে গেলো।

আচ্ছা, আমার যে এমন হচ্ছে, তোমাকে এতোদিন পর দেখে, আর কী সৌভাগ্য আমার, তোমার পাশে বসার সুযোগ হলো, তোমার হাত ধরতে পারলাম, তোমারও কি এমন হচ্ছে। তাহলে তুমি আসছো না কেন? তোমার না আমার কাছে আসার কথা।

এই সব লেখা। এই রকম। ফারুকের চোখ উষ্ণ প্রস্রবণের আকার নিলো। টপটপ করে জল ঝরছে। হাতের চিঠিটায় পড়ছে। দুজনের অশ্রু একই জায়গায় মিশে গেলো।

ফারুক চিঠিটাকে চুমু খেলো।

ভালোবাসা, তোমার জন্যে আমিও কাঁদছি।

www.shopnil.com

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি
আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থি

সকালবেলা চুলে শ্যাম্পু করলো অপি। গা রগড়ে রগড়ে খুব যত্ন করে গোসলো সারল। হ্যাপি ভাইয়ার পাঠানো শ্যাম্পু সাবান যে কাজে লাগতে পারে, এখন বোঝো।

আজ কী পরবে? জামা না শাড়ি! ফোন করে জেনে নিলে হয়, কিন্তু তাতে যাকে বলে সারপ্রাইজ দেওয়া, তাতো হবে না। নাহ। আগে থেকে এ নিয়ে আলোচনা করার দরকার নেই।

একটু আগেই ফোনে কথা হয়েছে। সকাল ১১টায় বলধা গার্ডেনের সামনে ফারুক আসছে।

আজ তাদের প্রথম, যাকে বলে, প্রেম করতে বেরোনো। পুরাকালের রোমান্টিক লোকেরা বলতেন অভিসার। নিউ জেনারেশন বলবে ডেট।

আমি বলব, ভালোবাসায় যাওয়া।

অপি তার ওয়ারড্রবে হাত দিলো। শাড়ি তার অনেক জমেছে, পরা হয় সামান্যই। সে একটার পর একটা শাড়ি বের করলো, আয়নার সামনে কাঁধের ওপর ধরে ধরে দেখলো কোন্‌টা কেমন মানাচ্ছে। শেষতক বেছে নিলো একটা টিয়ারঙ সবুজ শাড়ি। হয়তো, হেমন্তের গানের সেই বিষণ্ন মধুর সুর তার অবচেতনে বেজে উঠলো—সেই টিয়ারঙ শাড়িটা পরেছো। ম্যাচ করে শাড়ি, ম্যাচ করে ব্লাউজ। লিপস্টিক তো সবুজ পরা যাবে না, পরতে হবে টিয়ার ঠোঁটের রঙের। লাল। তা হলে কানের দুলটা লাল-সবুজে মেলানো হোক। একটা ছোট্ট নাকফুল। সবুজ-লাল। যেন একটা ছোট্ট বনফুল। সবুজ বৃন্তে লাল ফুল। দুহাতে চুড়ি, কাচের, অনেকগুলো। আর একটা ছোট্টো হাতব্যাগ। আরেকটু সাজগোজ করবে নাকি। গালে একটু সামান্য ব্লাশঅন! কপালে একটা বড়ো টিপ। সবুজ।

নিজেকে আয়নায় দেখে সে নিজের প্রেমে নিজেই পড়ে যায় আর কী!

'দাদি দেখো তো আমাকে কেমন দেখাচ্ছে'— দাদি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। বললেন, 'আকাশ থেকে একটা পরী নেমে এসেছে রে। ফুলপরী নয়, পাতাপরী। সবুজ। তো পরীর মেয়ে। তোমার ডানা দুটো কোথায়? হি হি হি। আয়, কাছে আয়'— দাদি তার দুগালে দুটো ছোট্টো চুমু এঁকে দিলেন।

শাড়ি পরে কি রিকশায় ওঠা যায়! একদিন মামাকে বলতে হবে ভক্সওয়াগনটায় যেন দুজনকে কোথাও থেকে ঘুরিয়ে আনে। বের হওয়ার মুখে মামার সঙ্গেই দেখা। মামা বললেন, 'এই এমন সেজেগুজে কোথায় যাচ্ছিস। তোকে তো দেখতে একদম রেখার মতো দেখাচ্ছে। এখন তোর তো একা একা যাওয়া উচিত নয়। দেশের পরিস্থিতি ভালো না। একটা জোয়ান

লোক সঙ্গে রাখ। আমাকে নে।'

'ইউনিভার্সিটি যাচ্ছি। ডিপার্টমেন্টে ফাংশন আছে।'

'ও। অপি, মাই ডিয়ার মাদার, এটফার্স্ট টেক মাই সালাম। পর সমাচার এই যে, তোর কাছে টাকা হবে?'

'কতো?'

'এই বিশ পঞ্চাশ একশো।'

অপি ব্যাগ খুলে তাকে বিশ টাকার একটা নোট দিলো। 'কতো হলো, হিসাব রেখো মামা।'

'সব হিসাব করছি। সুইস ব্যাংক থেকে টাকা তুলে তোকে শোধ করে দেব। বুঝলি না। একদম খালি পকেটে চলি কেমন করে। জোয়ান মানুষ তো।'

বলধা গার্ডেনে যখন পৌঁছলো তখন ১১টা বাজতে ৫ মিনিট বাকি। ভদ্রলোক এখনো আসে নি। এখন ঠা ঠা রাস্তায় সে দাঁড়িয়ে থাকবে। আবার টিকেট কেটে ভেতরে ঢুকবে, তাও উচিত হবে না। থাকার কথা গার্ডেনের সামনে, ভেতরে নয়। যদি তিনি গেট থেকেই ফিরে যান। যা বুদ্ধি, বুদ্ধির ঢেঁকি। সে অসহায় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ঘড়ি দেখতে লাগলো। ১১টা বাজে। ১১টা ১, ১১টা ২, ফারুক আসছে না। হায় হায় ভুলে গেলো নাকি। নাকি একসিডেন্ট করে বসলো। অপির বুকের ভেতরটা মোচড়াতে শুরু করেছে।

ফারুক এলো সোয়া এগারটারও পরে। এসেই বললো, 'দেরি করে ফেলেছি, কিছু মনে করো নি তো?'

রাগে অপির গাল তখন ফুলছে।

'আর বলো না। রাদ-শাদকে ইশকুলে দিয়ে আসতে হলো। বুবুর সর্দি সর্দি ভাব।'

অপি বোধ-হয় রেগে ফুলে ফেটেই যাবে।

ফারুক বললো, 'চলো কোথায় যাবে।'

অপি বললো, 'তুমি বলো।'

ফারুকের মনটা নেচে উঠলো। 'অপি তাকে তুমি করে বলছে। কাব্য করে বললো, 'চলো তবে অভিসারে।'

সামনেই একটা খালি রিকশা। ফারুক রিকশায় উঠে বসলো। বললো, 'ওঠো।

রিকশাঅলাকে বোঝালো, 'অভিসারে চলেছি, বুঝলেন।'

অপির কানে কানে বললো, অপু, লক্ষ্মীসোনা, রাগ করোনা। এই শোনো, পৃথিবীর সেরাদের তালিকা কি তোমার মুখস্থ।'

'মানে?'

'সবচেয়ে উঁচু পাহাড় এভারেস্ট। সবচেয়ে বড়ো নদী আমাজান। সবচেয়ে বেশি লোক চীনে। আর সবচেয়ে সুন্দর মেয়ে অপরাজিতা হক অপি।'

অপি ফিক করে হেসে ফেললো।

'তুমি হাসছ। এদিকে আমি আছি চিন্তায়। সিলেকশন কমিটিতে অবজেকশন গেছে। অপি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মেয়ে সত্য কিন্তু ওতো মানুষ নয় উর্বশী। স্বর্গ থেকে এসেছে। ওর নাম এ তালিকায় পাঠানো যাবে না। ওরা বলছে, যাহ, মানুষ কি এতো সুন্দর হতে পারে?'

www.shopnil.com

'স্যার, নামেন অভিসার আইসা গেছে।'

অপি আর ফারুক দেখলো, রিকশাঅলা তাদের হাটখোলায় অভিসার সিনেমা হলের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। দুজনেই হেসে ফেললো।

'চলো, কাচপুর ব্রিজে যাই, যাবে'— ফারুক বললো।

'চলো।' অপির আপত্তি নেই। পথ বেঁধে দিয়েছে বন্ধনহীন গ্রন্থি।

স্কুটারে দুজন গেলো কাচপুর ব্রিজে। ব্রিজের ওপরে উঠলো। রেলিং ধরে দাঁড়ালো। নিচে পানির দিকে তাকিয়ে রইলো। আকাশ মাজা কাঁসার বাসন। পানি নিটোল, ছোটো ছোটো ঢেউয়ের ফাঁক দিয়ে নিচের পলি দেখা যাচ্ছে।

'চল নৌকায় উঠি। সাঁতার জানো?' ফারুকের প্রস্তাব।

'সাঁতার জানি না। তুমি জানো?'

'জানি।'

'নৌকা ডুবে গেলে কী করবে? আমাকে ফেলে রেখে পাড়ে উঠবে?'

'না। তোমাকে পিঠে করে তীরে তুলবো। আর যদি তা না পারি, তোমার গলা ধরে গা ছেড়ে দেব। তোমার টানে যদি ডুবে যাই যাব। যদি ভেসে উঠি, উঠব।'

'তাহলে বেশ হবে। দুজনে মিলে মরা। তবে এখন আমার মরতে ইচ্ছে করছে না। বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করছে। তুমি আমাকে বাঁচিও।'

'আচ্ছা। তাহলে বেঁচে থাকাই যাক।'

'তবে একটা ঝামেলা হবে। আমার শাড়ি-টাড়ি সব ভিজে যাবে। আমি বাসায় যাব কী করে?'

'তাহলে বুবুর বাসায় যাব প্রথমে। সেখানে তুমি কাপড় পাল্টাবে। তারপর যাবে দোকানে। তোমার জন্যে নতুন একসেট কাপড় কিনব। সেসব পরে তারপর তুমি বাসায় যাবে।

'যাহ। সে বড্ড কেলেঙ্কারি হবে। পত্রপত্রিকায় ছবি ছাপা হবে। এই পানিতে কুমির নেই তো?'

'মনে হয় না।'

'তাহলে চলো। নৌকায় উঠি।'

একটা নৌকা ভাড়া করা হলো। ইঞ্জিনঅলা নৌকা। ছই আছে। কন্ট্রাক্ট হলো দু ঘন্টার। ১২ টা বাজে। চিপসের দুটো প্যাকেট কিনে ওরা নৌকায় উঠে পড়লো।

ওরা দুজন বসলো ছইয়ের বাইরে। পেছনে একটা লোক হাল ধরেছে। আরেকটা পিচ্চি আছে, পানি-টানি সেচার জন্যে।

সাঁই সাঁই করে বাতাসের ঝাপটা লাগছে চোখেমুখে। অপির চুল উড়ছে। দুজন পাশাপাশি বসে । সামনের দিকে মুখ। চারদিকে এতোকিছু দেখার, ওরা দুজন চুপ করে বসে আছে। অপি মাথা রাখলো ফারুকের কাঁধে। ফারুক অপির চুড়িগুলো নিয়ে খেলছে।

অপি বললো, 'জান, তোমার সঙ্গে এতো দেরি করে কেন দেখা হলো। আরো আগে কেন হলো না।'

ফারুক বললো, 'দেখা তো হয়েছিল। তুমি আমাদের ওখানে পড়লেই তো হতো। না পড়ায় ভালোই হয়েছে। রোজ রোজ দেখা হওয়ার চেয়ে এই এমনি করে বেরিয়ে পড়া ভালো। অভিসারে।'

অপি পেছনে তাকালো। ছইয়ের আড়ালে দুই মাল্লা। ওদের দেখা যাচ্ছে না।

অপি বললো, 'ফারুক আমাকে আদর করো।'

ফারুক কীভাবে আদর করবে, কোথায় আদর করবে? মুহূর্তের সংশয়। তারপর আলতো করে ওর মুখটা ধরে নিজের মুখটা এগিয়ে দিলো। দুঠোঁট ফাঁক করে ওর দুঠোঁটের ওপরে ধরলো। চকিত চুম্বন। স্বাদ মিটলে না। আবার মুখ এগিয়ে নিলো। ওর উপরের ঠোঁটটা দুঠোঁটের মাঝে রাখলো। এরপর নিচের ঠোঁট। আধমিনিট।

পটপট করে শব্দ হচ্ছে ইঞ্জিনের। মাথার ওপরে মাছরাঙা। দূর থেকে একটা লঞ্চ আসছে। ফারুক ঠোঁট সরালো। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলো, দুজন। আদরের সুখে দুজন খানিকক্ষণ আবিষ্ট।

'রোদ লাগছে. ছইয়ের নিচে যাবে?' ফারুক বললো—

'না, লোকগুলো কী ভাববে?'

'কী ভাববে?'

অপি উত্তর দিলো না।

নৌকার মুখ ঘুরতে শুরু করেছে। মানে প্রায় একঘন্টা গেলো। অপি গলুইয়ের মাথায় গিয়ে বসলো। চোখে যাতে রোদ না লাগে সে জন্যে। ফারুক তার পায়ের কাছে, কাঠের পাটাতনে। অবারিত আলোয় সে দেখছে দুখানি অপূর্ব পা। সবুজ শাড়ি, লালচে পাড়। গাঢ় উজ্জ্বল রং। সায়ার লেসের আভাস। তার নিচেই দুটো অসামান্য পা। কোলে তুলে নিলো।

'অ্যাই, কী করছো?'

'চুপ করে থাকো। কথা বললে ওরা ভাববে কী না কী করছি।'

ফারুক মুখ নামিয়ে অসামান্য পা দুটো চুমোয় চুমোয় ভরে তুললো।

'উম্, কী করছো, ছাড়ো....।'

'কালকে আমার পদধূলি নিয়েছিলে। আজ তার দাম নিচ্ছি।'

আহা, কী সুখ, নাকি এ ঠিক সুখ নয়, শান্তি তো নয়ই, আরামও নয়, কী যেন একটা অপির সমস্ত শরীরজুড়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

একটা শুশুক লাফ দিয়ে উঠলো জলে। ভুস করে ভেসে ফের ডুবে গেলো।

www.shopnil.com

সুন্দরের হাত থেকে ভিক্ষা নিতে বসেছে হৃদয়
নদীতীরে, বৃক্ষমূলে, হেমন্তের পাতাঝরা ঘাসে....

দিন যায়। ভালোয় ভালোয়। শরৎ পেরিয়ে যায়, হেমন্ত আসে। ভাপা পিঠার ভাপ ওঠে ঢাকার পথের ধারে পিঠা বিক্রেতার পিরিচে পিরিচে, বাজারে ওঠে ফুলকপি, বাঁধাকপি, পালংশাক। মেলা বসে গাঁওগেরামে, ঢাকা শহরে। গানের আসর, ফিল্মের উৎসব, নাটকের সপ্তাহ, কতো কী! রমনার অশ্বত্থমূলে, পাবলিক লাইব্রেরি আর জাদুঘরের চত্বরে, আর্ট ইন্সটিটিউটের বকুলতলায়, কতো গান কতো কবিতা। দুজন, একসঙ্গে যায় সে-সবে। হাত ধরে হাঁটে। পথের ধারে বসে ফুচকা খায়।

অপি আস্তে আস্তে খবরদারিপ্রবণ হয়ে ওঠে। এই চুলটা একটু ছোট করো, বড়ো চুলে তোমাকে যাত্রার সঙের মতো দেখাচ্ছে। সেভ করোনি কেন, কে তোমাকে ছ্যাক দিলো, বলোতো। এই, আমাদের একটা ঘর হবে না।

ঘরের কথায় ফারুক উদাসীন হয়ে পড়ে। সে তার হেড়ে গলায় গেয়ে ওঠে, লোকে বলে, বলেরে, ঘরবাড়ি বালা না আমার। কী ঘর বানামু আমি শূন্যের মাঝার। শূন্যতার মাঝে সে কী ঘর বানাবে! কোকিলের কি ঘর হয়?

না। ঘর সে বানাবে না। নীড় সে বাঁধবে না। বলে, 'এই তো ভালো আছি অপু, মুক্ত বিহঙ্গের মতো উড়ছি ঘুরছি। এই স্বাধীনতাটুকু নষ্ট করতে চাও।'

'এমনি মুক্ত স্বাধীনই থাকব। দুজনের একটা ছোট্ট ঘর হবে। তুমি না আর্কিটেক্ট। খুব সুন্দর করে সাজাতে পারবে।'

'তা পারবো। এমন স্বপ্নের ঘর কেউ কোনোদিন দেখেনি। পাখির বাসার মতো বানাবো। বাবুই পাখির বাসার মতো।'

'ধরো আমরা তো মোটে দুজন। স্বাধীনভাবেই কাটিয়ে দেব। ইচ্ছা হলে রাঁধব, ইচ্ছা হলে রাঁধব না। বাইরে বাইরে ঘুরব। কোনোদিন হয়তো সারা দিনরাত ঘুমুবো। বাইরে তালা ঝুলিয়ে ভেতরে কড়ার বোল্ট লাগিয়ে দেব। লোকে ভাববে বাড়ি নেই। তিনদিন তিনরাত শুধু ঘুমুচ্ছি। কী মজা হবে।'

'হুঁ মজা হবে। তবে বেশিদিন মজা থাকবে না। একগণ্ডা বাচ্চা নেবো। কেউ আমার ভুঁড়ির ওপর খেলছে। কেউ ঘাড়ের ওপরে চড়ছে।'

'যাহ। অসভ্য।'

'কী বলে। বাচ্চাদের মতো ভালো কিছু আছে! আমার ভাগ্নে দুটো শাদ আর রাদ— ওদের নিয়ে যে আমি একেকদিন কী করি না।'

একদিন অপিকে তার বোনের বাড়ি নিয়ে গেলো ফারুক। 'স্লামালেকুম বুবু'— অপি সংকুচিত ভঙ্গিতে বললো। আপা দৌড়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। চুমু খেলেন কপালে। তারপর, চিত্রকর ছবি এঁকে যেমন পিছনে দুকদম হেঁটে ছবিটা দেখে, তেমনি করে পিছিয়ে গিয়ে অপির দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। 'তুমি তো ডেনজারাস, তুমি তো ডেনজারাস। মারভেলাস। এমন রূপ থাকলে আমার মাটিতে পা পড়তো না। আমার এমন উড়নচণ্ডি ভাইটি তোমার বিউটিতে পুড়ে যাচ্ছে না।'

ভাই কিন্তু ততোক্ষণে এ ঘর ছেড়ে দুই ভাগ্নের কাছে চলে গেছে। 'অ্যাই, ভিডিও গেমটা ছাড়। দেখি, আজ কে জেতে?'

'আপনিও তো খুব সুন্দর'— অপি বললো,

'তুমি কিন্তু আজ ভাত খেয়ে যাবে। বাসায় ফোন করে বলে দাও।'

বুবু নিজ হাতে রাঁধতে লেগে গেলেন। 'ও মেয়ে, তোমাকে তুই করে বলি। তোর প্রিয় খাবার কী?'

'মাথা'— ফারুক ফোঁড়ন কাটলো।

ফারুক তাকে নিয়ে গেলো ভাগ্নে দুটোর কাছে। জমজ দুটো ফুটফুটে বালক। বুদ্ধিতে চোখ কী যে ঝকঝক করছে।

শাদ রাদ এক সঙ্গে ...ধরলো। 'অ্যাই, তুমি আমাদের কী হও।'

'আন্টি,— বললো অপি।

'আংটি। এসব কী ধরনের কথা। মামী হবে রে মামী—' ফারুক বললো।

'তোমরা বিয়ে করেছো?' দুজন আবার একসঙ্গে প্রশ্ন করে উঠলো।

অপি দুজনের জন্যে দুটো চকলেটের কৌটো এনেছিল। ওরা দুজন আবার একসঙ্গে বললো, 'থ্যাংক ইউ।'

'তোমাদের সবচেয়ে প্রিয় কে?' অপি বললো।

'মামা আর ফেলুদা আর জয়সুরিয়া।'

দুজনের সম্মিলিত জবাব।

'মামা আমাদের ক্রিকেট খেলা দেখতে স্টেডিয়ামে নিয়ে যায় না। তুমি নিয়ে যাবে।' শাদ বললো।

'তাহলে তুমিও আমাদের ফেভারিট লিস্টে চলে আসবে'— রাদ বললো।

বুবু ভাত মেখে অপিকে তুলে তুলে খাওয়ালেন। অপির খুব ভালো লাগলো বুবুকে। তার একটা বোন থাকলে কতো ভালো হতো।

বুবু বললেন, 'ফারুক ছেলেটা খুব ভালো। ওর মতো ব্রিলিয়ান্ট ছেলে আমাদের শহরে আর একটাও ছিলো না। কিন্তু এমন হাবাগোবা। ওকে একটু গাইড করো তো। হয় পড়াশুনা করুক নয়তো চাকরি-বাকরি করুক। নইলে ব্যবসা করুক। ওর দুলাভাই তো ওকে ক্যাপিটাল দিতে রাজিই।'

অপিদের বাসায়ও অভিষেক হলো ফারুকের। ইদানীং মেয়ের পাখা গজিয়েছে, গুঁটি কেটে

www.shopnil.com

বেরিয়ে অপি এখন প্রজাপতি, বাসার সবাই বুঝে গিয়েছিল।

বাবা বললেন, 'কী রে মা, একা একা হেসে খেলে বেড়াচ্ছিস। হাসিবাড়ির অন্য সবাইকেও একটু হাসার সুযোগ দে।'

মা বললেন, 'ছেলেটাকে একদিন আন। সালাম টালাম পেতে বুঝি আমাদের ইচ্ছা করে না।'

মামা বললেন, 'ওরে একজন জোয়ান লোকেরে অ্যাপয়েনমেন্ট দে কনসালটেন্ট হিসেবে। বিনা ফিতে তোদের আপদ-বিপদে কনসাল্টেন্সি দেবো।'

দাদি বললেন, 'কবে আনছিস বলে রাখিস। চুলে শ্যাম্পু দেবো। কলব লাগাবো। আরেকটু কাঁচা হলোদ এনে দিস তো। গায়ের রঙটা খুলতে হবে তো।'

তো অপি ফারুককে নিয়ে এলো তাদের বাসায়। বল্টু মামা বললেন, 'ইয়াংম্যান, ভেরি স্মার্ট। তো বাবা জোকস বললে বোঝো তো? হাসো তো।' অপি তাদের বাড়ি সম্পর্কে আগে থেকেই ধারণা দিয়ে রেখেছিল ফারুককে। ফারুক মৃদু হাসলো। অর্থাৎ হ্যাঁ, জোকস বুঝি।

প্রথমদিন এসেই কি ফারুক এদের সঙ্গে হিহি ডিডি করতে পারে নাকি! সে কথা বললো কম, রসিকতা করার চেষ্টা করলো না বললেই চলে।

অপি বললো, 'অ্যাই, তুমি না কতো মজার কথা জানো। এখন যে এমন ভিজে বিড়াল হয়ে গেলে।'

ফারুক বললো, 'ভাজা মাছটা উল্টিয়ে খেতে পারে না, কথাটার মানে কী? কই মাছের এক পাশটা খেয়ে কাঁটা উল্টিয়ে আরেক পাশ না খাওয়া। আচ্ছা, বিড়াল ভেজা হলে ভাজা মাছ উল্টিয়ে খাবে না, শুকনো হলে খাবে— এর রহস্য কী!'

সবাই হাসলো। মাত্র এটুকুনই। এর বাইরে সে অতি ভদ্রভাবে মা'র পায়ে সালাম করলো। বাবা সালাম করতে দিলেন না, বুকে টেনে নিলেন। আর দাদি তো কপালে চুমুই দিয়ে দিলেন।

অপি বললো, 'ভালো হবে না দাদি।'

হাসির হুল্লোড়।

সবাই এটা ওটা গল্প করছে। চা-নাশতা এলো। খাওয়া-দাওয়া চলছে। ফারুক তার ব্যাগ থেকে একটা রাইটিং প্যাড বের করে হিজিবিজি আঁকছে। গল্পে তার তেমন উৎসাহ নেই। শুধু হুঁ-হাঁ করে যাচ্ছে।

ফারুকের যাওয়ার সময় হলো। অপি তাকে এগিয়ে দেওয়ার জন্যে বেরুলো। বললো, অ্যাই তুমি এতো গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলে কেন? জানো না এটা হাসিবাড়ি। এ বাড়িতে হাসতে হয়। হাসাতে হয়। আল্লাই জানে, তুমি পাস করলে না ফেল করলে।'

এদিকে ফারুক-অপির প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে ফ্লোর নিয়ে ফেললেন মামা। বললেন, 'নাহ বড্ডো মেনিমুখো। ১০০-তে বড়ো জোর ৩০ মার্কস দেওয়া যায়। অন্তত ৪০ না পেলে তো পাস করানো যায় না। দুলাভাই, আপনি কি একে ১০ নম্বর গ্রেস দিতে পারেন। বি গ্রেসফুল দুলাভাই। অপির মুখের দিকে চেয়ে।'

ফারুক রিকশায় ওঠার আগে অপির হাতে ধরিয়ে দিলো তার হাতের রাইটিং প্যাডটা। অপি ভাবলো কোনো বার্তা-টার্তা হবে। খাতা খুলে তো অপি মহাখুশি। ওমা একী! ফারুক

বসে বসে বাসার সবাইকে নিয়ে কার্টুন এঁকেছে। অবিকল বল্টু মামাকে এঁকে লিখেছে : জোয়ান লোক সঙ্গে রাখা ভালো। দাদিকে এঁকে তার মুখে সংলাপ দিয়েছে : আমি ভেবেছিলাম ছোটোদের রবীন্দ্রনাথ আসছে, এ-যে দেখছি রবির র-ও নয়। মাকে এঁকেছে, তার পায়ে সালাম করছে সে নিজে। আর বাবাকে এঁকে সংলাপ দিয়েছে : হাসিবাড়িতে এ ভিজে বিড়ালটা ঢুকলো কী করে!

অপি তাড়াতাড়ি করে ঘরে এলো। মামা তখনও ১০ নম্বর গ্রেস দেওয়া উচিত কি উচিত না ভাবছেন। তার হাতে অপি ধরিয়ে দিলো খাতাটা। সব দেখে মামা চিৎকার করে উঠলেন, 'একশোয় একশো, একশোয় একশো।'

সবাই কাড়াকাড়ি করে দেখলো খাতাটা। বাসায় হাসির বোমা ফাটলো বলে।

www.shopnil.com

আসা-যাওয়ার পথের ধারে গান গেয়ে মোর কেটেছে দিন।
যাবার বেলায় দেব কারে বুকের কাছে বাজল যে বীণ॥

ঢাকা স্টেডিয়ামে খেলতে আসছেন জয়সুরিয়া, রানাতুঙ্গা।

রাদ ও শাদ মামার গলায় ঝুলে পড়লো। মামা, খেলা দেখতে যাবো, খেলা দেখতে যাবো। তারা ফোন করলো অপিকে, 'আন্টি, তুমিও চলো। তুমি গেলে মামা নিয়ে যেতে রাজি হবে।'

অপি তাল ঠুকলো, 'ঠিক আছে, চলো যাই।'

মুশকিল হলো তারা কোন্ গ্যালারিতে ঢুকবে। শাদ রাদ সমর্থক আবাহনীর, আর শ্রীলঙ্কার, বিশেষ করে অন্ধভক্ত জয়সুরিয়ার, কিন্তু জয়সুরিয়া-রানাতুঙ্গা আজ খেলবেন মোহামেডানের হয়ে। অপি অবশ্য পাড় মোহামেডান, আর ফারুক আবাহনীর দূরবর্তী সমর্থক। রাদ 'শাদ বললো, আমরা মোহামেডান গ্যালারিতে বসবো না না না।'

বুদ্ধি করে ওরা ঢুকলো নিউট্রাল গ্যালারিতে। কিন্তু সমস্যা হলো ওখান থেকে পিচটা একটু বেশি দূরে। সঙ্গে তারা নিলো এক ফ্লাস্ক চা, প্রচুর স্ন্যাকস এবং একটা বায়নোকুলার। জয়সুরিয়া রানাতুঙ্গা বিমানবন্দর থেকে সরাসরি ঢুকলো স্টেডিয়ামে।

প্রথমে ব্যাট করলো মোহামেডানই। মাত্র ২৩ রান করে জয়সুরিয়া আউট। বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন বিশ্বরেকর্ডধারীর এই অবস্থা?

অপি এ প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে দুভাই একযোগে প্রতিবাদ করা শুরু করলো। 'না না জানো না, আমাদের পিচ খারাপ। এই আর্টিফিসিয়াল টার্ফে ভালো খেলোয়াড়রা খেলতে পারে না। বোলার নিজেই বোঝে না কোন বল সুইং করবে কোনটা করবে না।'

খানিক পরে রানাতুঙ্গাও আউট হয়ে গেলো। রাদ শাদ বললো, 'বলেছিলাম কিনা, এই উইকেট ভালো ব্যাটসম্যানের জন্যে নয়।'

অপি বললো, 'নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা।'

রাদ শাদ ভ্যা করে কেঁদে ফেললো।

কী মুশকিল কী মুশকিল। এখন অপি কী করে। সে হাসিবাড়ির মেয়ে। হাসানোর নানা কায়দা-কানুন সে জানে। সে বললো, 'আমার মনে হয়, উইকেটে কোনো ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করা হয়েছে, ফেলুদাকে দিয়ে তদন্ত করালে ব্যাপারটা ধরা পড়বে।'

জমজ এ দুভাই, সারাক্ষণ ফেলুদার গোয়েন্দা কাহিনী পড়ে, সব জায়গায় এডভেঞ্চারের গন্ধ খুঁজে ফেরে। তারা বললো, 'খুব ভালো হয়, ফেলুদা যদি ঢাকায় আসেন।'

রাদ বললো, 'আর খেলা দেখবো না, চলো বাড়ি চলো।'

শাদ বললো, 'ঠিক কথা, ভালো লাগছে না আর।'

তারা গ্যালারি ছেড়ে বেরুলো। গেলো স্টেডিয়ামের বইয়ের দোকানে। শাদ রাদ খুবই খুশি। তারা বই বাছতে লাগলো। ছোটোদের ভালো বই প্রায় সবই ওদের পড়া। পুজো সংখ্যা আনন্দমেলা আর একটা জাফর ইকবাল সমগ্র ওদের কিনে দিলো অপি। ফারুক দাম দিতে চাইলো। অপি বললো, 'না না এই বই দুটো আমি ওদের দিচ্ছি। কী মনে করো আমাকে! স্টাইপেন্ডের টাকা পুরোটা পাই হাতখরচ হিসেবে।'

রাদ বললো, 'মামা কানে কানে একটা কথা বলব।' মামা কান পাতলেন। রাদ তার কী এক গোপন কথা জানালো মামাকে।

সাদ বললো মামা, আমারও একটা গোপন কথা আছে। মামা কান পাতলেন। শাদ তার গোপন বার্তা পেশ করলো, মাতুলের কর্ণকুহরে। কৌতূহলী দৃষ্টিতে অপি ফারুকের দিকে তাকিয়ে বললো, 'কী ব্যাপার, আমার নিন্দা করা হচ্ছে বুঝি।'

ফারুক বললো, 'না না। জরুরি আবহাওয়া বার্তা। ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত নয়। দু নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত। দুই ভাইয়ের বাথরুম পেয়েছে।'

দুইভাই তখন আকারে ইঙ্গিতে মামাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে, 'মামা বলে দিও না।'

অপি হাসলো।

ফারুক বললো, 'এখানে আর ভদ্রলোকের বাথরুম কোথায় পাবো? চলো, বাসায় ফিরে যাই।'

শাদ রাদ বললো, 'তাই চলো।'

একটা স্কুটার নিয়ে অপি ফারুক বসলো সিটে। সাদ রাদ একজন বসল অপির কোলে, একজন ফারুকের। আসার সময় শাদ বসেছিল মামার কোলে, রাদ অপির— এবার ওরা বসলো কোল বদল করে। একজনকে সিটে বসিয়ে নেওয়া যেতো, কিন্তু ওরা দুজনেই হয় সিটে বসবে, নয়তো কোলে বসে যাবে।

ওদের বাসায় পৌঁছে অপি বললো, দুজন আমার দুগালে দুটো পাপ্পি দাও।

ওরা দিলো।

তারপর বাথরুম লক্ষ্য করে এক ছুট!

www.shopnil.com

এই মালঞ্চ নিয়তিময়
ফুল ধরেছে মৃত্যুগাছে
বাইরে যাবার রাস্তা কোথায়?
শুধোও না ঝাউপাতার কাছে!

ফারুকের আপার ড্রাইভার কুদ্দুসের বাড়ি সাভারে। সে বাড়ি যাচ্ছে, আজ তার প্রথম পুত্রের আকিকা। ছেলের নাম রাখা হয়েছে সাদ্দাম হোসেন। কুদ্দুস খুবই সাদ্দাম হোসেনের ভক্ত। শুধু এ কারণে সে ইনকিলাব পড়ে। ইনকিলাব পড়ে বলে ফারুক তাকে তিনবার লাস্ট ওয়ার্নিংও দিয়েছে। ফল হয় নি। 'বাপের বেটা সাদ্দাম, দেখছেন আমেরিকার সাথে লড়াই কইরা টিইকা আছে। আরে হাতি ঘোড়া রাশিয়া জার্মানি গেলো তল, দ্যাখেন সাদ্দাম হোসেনের হাঁটু ভেজে না।'

দুপুরবেলা দুই খাসি জবাই হবে। শুক্রবার। কুদ্দুস বললো, 'আপা গাড়িটা দ্যান, যাব আর আসব।' রাদ ও সাদ বললো, 'আমরাও যাব, আমরাও যাব।'

সেদিন আবার দুপুরবেলা রাদ শাদের বাবা ডাক্তার মনজুরুল আহসানের দাওয়াত, হোটেল সোনারগাঁওয়ে। ফিজিসিয়ান এসোসিয়েশনের বার্ষিক কনভেনশন। দাওয়াত শুধু স্বামী-স্ত্রীর। এখন ছেলে দুটো কী করবে!

ফারুক তো সকাল থেকেই নেই। পাবলিক লাইব্রেরিতে ফিল্ম সোসাইটির ফেস্টিভাল। সারাদিন ফিল্ম দেখাচ্ছে। পৃথিবীর সেরা ছবিগুলো। যুগলে বেরিয়ে পড়েছে, নিশ্চয়।

কুদ্দুস বললো, 'আপা, আপনেরা যাইবেন না, এটাই তো বড়ো দুঃখের কথা। আমার ভাইগনা দুইটা যাক।'

যাক। ওদের মা ওদের সঙ্গে একটা সোনার চেইন দিলেন, অর্নামেন্ট বক্সে করে, কুদ্দুসের ছেলে সাদ্দাম হোসেনকে উপহার দিতে।

ছেলে দুটো সাভার গেলো। দুটো খাসি জবাই হচ্ছে, গ্রামে, কুদ্দুসের বাড়িতে হৈ চৈ। শুধু কুকুর খেদানোর জন্যেই তিনজন লোক বাঁশ হাতে কর্তব্যরত।

পোলাও রাঁধা হচ্ছে। গন্ধে আঙিনা মৌ মৌ করছে। বাড়ি পৌঁছে কুদ্দুস লেগে গেলো কাজে, প্রথমেই একটা কাজের মেয়ের গালে চড় মেরে বললো, 'ওই, তার নাকে সর্দি ক্যান্, মাইনষেরে ডাইকা সর্দি খাওয়াইবি।' তারপর হাঁক ছেড়ে বললো, 'আমি আইসা পড়ছি আব্বাজান, আমেরিকারে শায়েস্তা করতে আমি আইসা পড়ছি। রান্নাবান্নার কতদূর। ডেকোরেটরের কে আসছে? পেলেট ধোওয়া হইলো!'

রাদ আর শাদ সাদ্দামের গলায় সোনার চেন পরিয়ে দিলো। তাদের দৃষ্টি বাইরে। ধূ ধূ গ্রাম,

ধানকাটা হয়ে গেছে, গাছগাছড়ায় ধূলির আস্তর, কাঁচা রাস্তা দিয়ে ব্রাকের এক মহিলা কর্মী ধূলি উড়িয়ে মটর সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে, পাল পাল গরু চড়ছে ক্ষেতে— সেসব ছাড়িয়ে দুভাই দেখছে— ওই স্কুলের মাঠে ছেলেরা ক্রিকেট খেলছে।

'কুদ্দুস মামা, আমরা ক্রিকেট দেখতে যাই।'

'যাবা?'

'যাব, যাব।'

'আইচ্ছা যাও। ওই রকেট মিয়া, এই দুই সাহেবরে ক্রিকেট খেলা দেখায়া আনো।'

ওরা তিনজন চললো। রকেট ওদেরই বয়সী। শাদ বললো, 'তোমার নাম রকেট!'

'হ'।

রাদ বললো, 'তুমি ইশকুলে যাও।'

'হ, ওইটাই তো আমাগো ইশকুল।'

'তুমি ক্রিকেট খেলতে পারো?'

'পারি। আমারে লয় না।'

ওরা ইশকুল মাঠে পৌঁছে গেলো। টেনিসবল, কাঠ কেটে বানানো ব্যাট, বাঁশের উইকেট, স্ট্যাম্প। স্কুল ঘরে বল লাগলে দুই রান, পুকুরে বল পড়লে কোনো রান নাই।

খেলা চলছে। দুইভাই দেখছে। তার চেয়েও তাদের কাছে আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে পুকুরটা।

কেউ জানে না, কখন দুইভাই পুকুরে নেমে গেছে। তাদের শার্ট-সোয়েটার রয়ে গেছে পাড়ে।

দুজন সাঁতার কাটতে চেষ্টা করলো। খুবই ঠাণ্ডা পানি। পরনে জিনসের ফুলপ্যান্ট, ভিজে ওদের পা টেনে ধরলো, হঠাৎই পানি গভীর হয়ে গেছে। শাদ ডুবে যাচ্ছে, রাদ তাকে বাঁচানোর জন্যে সেদিকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সাদ ধরেছে রাদকে, রাদ ধরেছে শাদকে।

একবার দুইভাই চিৎকার করে উঠল, 'রকেট রকেট, বাঁচাও, আমরা ডুবে যাচ্ছি।'

তখনই মিডল স্টাম্প পড়ে গেলো। উপস্থিত দর্শকরা তালি দিচ্ছে। এক ব্যাটসম্যান ফিরে আসছে, আরেকজন যাচ্ছে।

দুই ভাইয়ের আর্তচিৎকার কোথায় হারিয়ে গেলো। ওপরে কার্তিকের আকাশ। নীল। রোদে জ্বলা। পুকুরের পাড়ে লম্বা লম্বা ঘাসের ডগায় ফড়িং উড়ছে। কিনারের স্বচ্ছজলে ডানকানি মাছের ঝাঁক।

জলের মধ্যে দুজন ডুবে গেলো। দুইভাই। বুড়বুড়ি উঠলো খানিক, তোলপাড় করা জল শান্ত হলো।

আরো কতোক্ষণ পর বল পড়লো পুকুরের জলে। দক্ষ ছেলেরা প্যান্ট বাঁচিয়ে বাঁশের ডগা দিয়ে বল ডাঙায় তুললো।

পুকুরে বল গেলে 'নো রান'।

এরপর নিয়ম করতে হবে, পুকুরের পানিতে বল পড়লে ২ রান কাটা।

পুকুরের পাড়ে কেন উজ্জ্বল জামাগুলো পড়ে আছে কেউ খেয়াল করলো না।

www.shopnil.com

ফিল্ম-টিল্ম দেখে, অপিকে তার বাসায় পৌঁছে দিয়ে, রাত নটায় ফারুক এলো বাসায়। বাসায় কেউ নেই। শুধু কাজের বুয়া। সে কাঁদতে লাগলো, 'ও ভাইজান, আপনে কোটে গেছলেন, সর্বনাশ হয়া গেইছে, সর্বনাশ।'

'কী সর্বনাশ, কেঁদো না তো বুয়া, খুলে বলো'— ফারুকের বুক কাঁপছে, হাত পা নিঃসাড়, শরীর শক্তিহীন।

'রাদ বাবু শাদবাবুর মনে হয় কিছু একটা হইছে।'

'ওরা কোথায়?'

'সাভারে কুদ্দুস ভাইজানের বাড়িত গেছলো। ওটে থাকি ফোনে খবর আসছে। খবর পায়াই আপা আর সাহেব বাইর হয়া গেইছেন। আপা কান্দা-কাটি করিয়া বেহুঁশের লাকান হয়া গেছেন। ও ভাইজান কী হইবে এখন।'

ফারুকের সমস্ত শরীর গুলিয়ে উঠলো, মনে হয় পৃথিবীটাই উল্টে যাচ্ছে, সে চোখে আঁধার দেখছে, ধপ্ করে বসে পড়লো। সম্বিত ফিরে পেয়ে সে স্থির করলো কর্তব্য। সে সাভার যাবে। কুদ্দুস মিয়ার ঠিকানা সে জানে। গাড়িতে একা উঠলে ড্রাইভারের সঙ্গে সে নানা গল্প করতো। মানুষের বিচিত্র জীবনকাহিনী শুনতে তার ভালোই লাগে।

সে একটা স্কুটারে উঠলো। চলো সাভার বাজার। সাভার বাজারে পৌঁছাতে বেজে গেলো রাত পৌনে এগারোটা। তখন বাজার পাতলা হতে শুরু করেছে। একটা দুটো চায়ের দোকান তখনও খোলা। একটা চায়ের দোকানে গিয়ে ম্যানেজারকে সে বললো, 'ভাই, নন্দীপুরের কুদ্দুস ড্রাইভারের বাড়িতে আজ কি কোনো এক্সিডেন্ট হয়েছে, বলতে পারেন।'

ম্যানেজার মাথা নাড়লো। ক্যাশ বাক্সে তার হিসাব মিলছে না, চোখ তুলে তাকানোর অবকাশও তার হয় না।

একটা বেয়ারা এগিয়ে এলো। 'ছারে কি কিছু জিগাইছিলেন?'

'নন্দীপুরে আজ কি কোনো এক্সিডেন্ট হয়েছে।'

'এক্সিডেন্ট মানে কী ধরনের?'

'না, দুটো বাচ্চা ছেলে....।'

'হইতে পারে। কিছু একটা হইছেই মনে হয়। দুইজন কাস্টোমার গল্প করতাছিল। হুনলাম। থানা-পুলিশ হইছে। আপনে থানায় খোঁজ লন।'

একই স্কুটারে চড়ে ফারুক থানায় গেলো। সেখানে গিয়েই সব জানতে পারলো। দুটো বালক পানিতে ডুবে মারা গেছে। রাদ আহসান ও শাদ আহসান (৮)। নন্দীপুর ফ্রি প্রাইমারি স্কুলের পুকুরে ডুবে। স্কুল চত্বরের ক্রিকেট খেলারত ছেলেরা পুকুর থেকে ছেলে দুটোকে উদ্ধার করে গণস্বাস্থ্য হাসপাতালে নিয়ে যায়। ডাক্তার তাদের মৃত ঘোষণা করেন। থানায় জিডি হয়েছে। পুলিশ লাশ দুটো ময়নাতদন্তের জন্যে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছে।

'ভিকটিমের মা-বাবা আসছিল। ওনারাই এম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করছে। এখান থেকে ডিএমসিতে পাঠানোর এরেঞ্জমেন্ট করছে—' থানার ডিউটি অফিসার বললেন।

ফারুকের মনে হতে থাকলো, সেই অপরাধী। সেই হত্যা করেছে তার ভাগ্নে দুটোকে।

এখন বুবুর সামনে সে যাবে কী করে!

হায় হায়। বুবু এখন কী করছেন?

বাচ্চা দুটো কি এখন শুয়ে আছে লাশ কাটা ঘরে— অন্ধকার টেবিলের ওপরে।

তার মনে সামান্য আশা, হয়তো অন্য দুটো বাচ্চাকে রাদ-শাদ বলে ভুল করা হচ্ছে। সে নিজচক্ষে দেখতে চায়, দেখে সিদ্ধান্ত নিতে চায়— ওরা সত্যি রাদ-শাদ নয়।

সে স্কুটার নিয়ে রওনা হলো ডিএমসি মর্গে। মর্গের পাশেই ডোমের ডেরা। ফারুক তাদের দরজায় কড়া নাড়লো। মর্গের দরজাটা একটু খুলুন। আমার রিলেটিভ মারা গেছে কিনা, আমি দেখব।

দরজা খুললো একজন তরুণ। ডোম বললে চেহারা-সুরত যেমন হবে বলে মনে হয়, এ তেমন নয়। সে রাগী গলায় বললো, 'মর্গের তালা খোলার কোনো নিয়ম নাই। যান যান।'

ফারুক কাঁদতে কাঁদতে বাসায় ফিরে এলো।

ক্ষীণ আশা হয় তো গিয়ে দেখবে রাদ শাদ খেলছে, পড়ছে, হাসাহাসি করছে। বাড়ির সামনে গাড়ির ভিড়। ভেতরে ঢুকে দেখলো, বুবু অজ্ঞান হয়ে গেছেন। তার পাশে নার্স। দুলাভাই নিজেই বড়ো ডাক্তার। লোকজন আত্মীয়-স্বজন বাড়িতে বিক্ষিপ্ত ও চিন্তিতমুখে ঘুরছে।

দুলাভাই তাকে দেখে কিছুই বললেন না। তার মুখ থমথমে।

ফারুক হাউমাউ করে কেঁদে উঠেই জ্ঞান হারিয়ে ফেললো।

পরদিন সকাল। অপি খবরের কাগজ পড়ছে। নিতান্ত নৈমিত্তিক ভঙ্গিতে। হঠাৎ প্রথম পাতায় বর্ডার দেওয়া দুই বালকের ছবির ওপর তার চোখ পড়লো। এ কী! রাদ সাদ আর নেই। তার শরীর হিম হয়ে গেলো। মনে হলো শিরদাঁড়া বেয়ে একটা বরফশীতল সাপ নেমে যাচ্ছে।

www.shopnil.com

ছোট্ট যে জন ছিলরে সবচেয়ে
সেই দিয়েছে সকল শূন্য করে

রাদ-শাদের মৃত্যুতে ফারুকের প্রতিক্রিয়াটা যে ভয়াবহ হবে, তা অপি সহজেই বুঝতে পারে। তারা তো কেবল তার ভাগ্নে ছিলো তাই নয়, বন্ধুও ছিলো। যেকোনো চলে যাওয়া, যেকোনো শূন্যতাই দুঃখজনক, কিন্তু শিশুর মৃত্যু, তরুণের মৃত্যু, যুবকের মৃত্যু সহ্য করা কঠিন। এই দুর্ঘটনা ফারুকের জীবনটাতে এক কালো ছায়া ফেলে রেখে গেলো।

অপি নিজেই কি সামলাতে পেরেছে এ শোক! পুরো হাসিবাড়ি স্তম্ভিত হয়ে গেছে এ-বিয়োগব্যথায়। আর পত্রিকায় মানবিক প্রতিবেদন লেখা হয়েছে বড়ো করুণ মর্মস্পর্শী করে, সে সব পড়ে সবাই স্তম্ভিত।

কিন্তু অপি কল্পনা করতে পারে না ছেলে দুটোর বাবা-মার শোকটা কতো অসহ্য, কতো তীক্ষ্ম, কতো রক্তক্ষয়ী, যন্ত্রণাময়। বুবু এখন কী ভাবেন, কী করেন?

আহা কী সহজ সরল ভালো মানুষ একজন মহিলা। এতো বড়ো আঘাত কেন তার ওপর নেমে এলো? দুনিয়ার এ কী অবিচার!

আহারে নিষ্পাপ ছেলে দুটো! তাদের সঙ্গে অপির শেষ দেখা একই সঙ্গে দুটো চুম্বনের মধ্যে দিয়ে।

সেই সব কথা অপির মনে পড়ে। মনে পড়ে ছেলে দুটোর স্বাস্থ্যবান শরীর, সিল্কি চুল, খাড়া খাড়া কান, আর বুদ্ধিতে ঝিকমিক করা চোখগুলো।

দুর্ঘটনার খবর পেয়েই অপি ছুটে গিয়েছিল ওদের বাসায়। তখনও মৃতদেহ আসেনি মর্গ থেকে। বুবু তখন পুরোপুরি বিধস্ত, তাকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। দুলাভাই ছেলে দুটোর লাশ আনানোর জটিলতা নিয়ে তবু এক ধরনের লিপ্ততার মধ্যে আছেন। ফারুককেও পাওয়া গেলো না। সে হাসপাতাল-পুলিশ করছে।

কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন শোকটাও তো একদিন মানুষের কাছে সহনীয় হয়ে আসে।

দিন যায়। কুলখানি হয়। রংপুর থেকে এসেছেন মৃতদের নানা-নানি। কুমিল্লা থেকে দাদি। মিলাদ মাহফিল হয়। তারপর একদিন আসে চল্লিশতম দিন। চল্লিশার আনুষ্ঠানিকতাও সম্পন্ন করতে হয়।

এ কটা দিন প্রায়ই অপি যেতো ওই বাড়িতে। বুবুই তাকে বলেছেন, বোন, তুই আসিস। গেলে বুবু তার হাত ধরে বসে থাকতেন। নীরবে অশ্রু বিসর্জন করতেন। এই বাড়ির প্রতিটা ইঞ্চিতে প্রতিটা আসবাবে জিনিসে লেগে আছে ছেলে দুটোর স্মৃতি। ওদের বইপত্র কাপড়-চোপড়

বিছানাবালিশ জুতো সাইকেল খেলনাপাতি— সব পড়ে আছে। দেওয়ালে ওদের বড়ো বড়ো ছবি।

ফারুক এসেছে হাসিবাড়িতে। অপিকে নিয়ে বেরিয়েছে ও। হাসির কথা উঠলে হেসেছেও তারা। জীবন এ-রকমই। খেতে হয়, পরতে হয়, স্নান সারতে হয়— কে কার জন্যে বসে থাকে।

এর মধ্যে ফারুক তার বাবা-মায়ের সঙ্গে পরিচয় করে দিয়েছে অপির।

ফারুকের মাও বুবুর মতোই, মাটির মানুষ।

একদিন, চল্লিশার পর, অপিকে ডেকে নানা গল্প করলেন। নিজের খামারের কথা, ফারুক-নেহলিনের ছোটোবেলাকার কথা। খোঁজখবর নিলেন অপিদের।

তারপর ঘরে যখন কেউ নেই, কেবল তিনি আর অপি একা, তিনি অপির হাত ধরলেন। তার চোখ দিয়ে টপটপ করে ঝরছে পানি। বললেন, 'মা, আমার ফারুক বড়ো ভালো ছেলে। কিন্তু একটু ভবঘুরে টাইপ। দায়িত্ব বোঝে না। নিতেও চায় না। কোনোদিন ঘর-সংসারের কথা ভাবে না। বিয়ের কথা বললে এড়িয়ে যায়।

আমার মাত্র এক ছেলে এক মেয়ে। এর মধ্যে নাতিদুটোকে হারালাম। তোমার বুবুর তো আর বাচ্চা-কাচ্চা হবে না। এখন আমার কি নাতি-নাতনির মুখ দেখার সাধ-আহ্লাদ নাই! ফারুককে বোঝানো যায় না। তুমি মা ফারুককে বোঝাও। ওর তরফে যদি একটা নাতি পাই, তা হলেও তো এই শোকে খানিক সান্ত্বনা আসে। তোমার বুবুও একটা আশ্রয় পায়, না হলে তো মেয়েটা বাঁচবে না। কী চেহারা হয়েছে মেয়েটার।'

ফারুকের বাবা-মা রংপুরে চলে গেলে নির্জন নীরব বাড়িতে অপি মাঝে মধ্যেই যায় বুবুর কাছে। সন্তান হারিয়ে বুবুও যেন এখন অপিকেই তার ছায়া হিসেবে পেয়েছেন। তাকে কাছে কাছে রাখতে চান। তার হাত ধরে বসে থাকেন। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে রাখেন। এটা ওটা কিনে দেন। ভালোমন্দ খাওয়ানোর জন্যে অস্থির হয়ে যান।

একদিন বুবুও বললেন, 'অপি রে, তোরা তাড়াতাড়ি বিয়ে কর। তোদের বাচ্চাটা মানুষ করার দায়িত্ব আমার। মা হিসেবে না হোক, আয়া হিসেবে তোরা আমাকে নিস।'

অপি তাড়াতাড়ি বুবুর মুখ চেপে ধরলো। বললো, 'বুবু, তুমি কি আমাকে পর ভাবো। তাহলে কিন্তু খুবই দুঃখ পাবো বুবু।'

ফারুকও বুঝতে পারে, আস্তে আস্তে দায়িত্ব তার কাঁধে এসে পড়ছে। কেবল সিনেমা-নাটক-আবৃত্তি-পত্রিকা করে দিন যাবে না। এবার কিছু একটা করতে হবে। স্থপতি হিসেবেই হয়তো ক্যারিয়ারটা শুরু করতে হবে। একদিন, আর্কিটেকচারের মাস্টার্স কোর্সে ভর্তি হয়ে এলো।

তাতে সবাই খুশি। বুবু খুশি। অপি তো বটেই।

মৃত্যু তার শোকের ছায়াটা আস্তে আস্তে সরিয়ে নিতে লাগলো।

www.shopnil.com

পৃথিবী প্রবীণ আরো হয়ে যায় মিরুজিন নদীটির তীরে,
বিবর্ণ প্রাসাদ তার ছায়া ফেলে জলে।

পৃথিবী প্রবীণতর হয় প্রতিদিন, স্টেডিয়ামে উইকেট পড়ে, ১০০ মিটার দৌড়ের সময়কাল আরো একটু কমে আসে, মেয়েদের জামার ছাঁট বদলায়, পৃথিবী থেকে কোনো একটা প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে পড়ে, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা একটু বাড়ে, কম্পিউটারের নতুন প্রজন্ম আবিষ্কৃত হয়। এক নম্বর নায়িকা পিছাতে পিছাতে শীর্ষতালিকার বাইরে চলে যায়, শেয়ার মার্কেটে ধস নামে, শেয়ার মার্কেট চাঙ্গা হয়, ঋণখেলাপি ফিতা কাটে, রাস্তায় পুলিশের সঙ্গে দাঙ্গায় মাতে বিরোধী দল।

একদিন ফারুকের কাছে হঠাৎই ফোন করে মোহন।

'এই ফারুক। কেমন আছিস?'

'ভালো। এই তো দিন কেটে যাচ্ছে।'

'তুই কি খুব ব্যস্ত ফারুক।'

'না, আমার আর ব্যস্ততা কী?'

'গুড। তুই তাহলে আমার সঙ্গে লাঞ্চ কর আজকে। সময় হবে?

'হঠাৎ। কী ব্যাপার?'

'ব্যাপার আছে। কী ব্যাপার সেটা জানার জন্যেই তুই আয়। এক কাজ কর দুপুরে তুই কুঁড়েঘর রেস্টুরেন্টে চলে আয়। ঠিক একটায়, ওকে!'

দুপুরবেলা ফারুক গিয়ে ঢুকলো কুঁড়েঘরে। এর আগে সে কখনো এ রেস্তোরাঁয় আসেনি। তাজ্জব ব্যাপার। ঢাকা শহরের ভেতরেই একটা এঁদো গাঁও বানানো হয়েছে। কচু-কচুরিপানাঅলা নালা, 'বাঁশের সাকোঁ', বিচালির স্তূপ। একটা ঢেঁকিপাড়। কুয়োতলা। বাঁশ কাঠ দিয়ে বানানো চেয়ার-টেবিল, টঙ ধরনের। হ্যারিকেনের চিমনির ভেতরে বাল্ব। ভালোই তো। অপিকে একদিন আনতে হয়।

খাওয়া-দাওয়া দেশি, তবে একটু বাড়াবাড়িও আছে। ইয়া বড়ো চিতল মাছের পেটি। কাটারিভোগ চাউলের ভাত। কাসুন্দি।

মোহন এলো একটু পরেই, মোবাইল হাতে। বললো, 'ঝামেলার ওপরে ঝামেলা। একটা প্যাকেজ সিনেমা বানাচ্ছি। সবাই তো বানায় নাটক, আমি বানাবো সিনেমা। বুঝলি না, ব্যবসায় আসল হলো আইডিয়া। নিউ আইডিয়া।'

ফারুক বললো, 'আচ্ছা এখানে প্লেটে ভাত দিচ্ছে কেন? কলাপাতায় ভাত দিলেই পারতো, নিদেনপক্ষে মাটির শানকি।'

মোহন বললো, 'অন্তত কাঁসার বাসন কোসনে তো দিতে পারতোই। বাদ দে। যে জন্যে ডেকেছি...।

টি টি করে মোবাইল ফোন বেজে উঠলো। মোহন ওটা অফ করে রাখলো, চোখেমুখে তার বিরক্তি।

'শোন, ঢাকা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির কাজটা পেয়ে যাচ্ছি। পুরো ক্যাম্পাসের প্লান, ডিজাইন, কনস্ট্রাকশন কনসাল্টেন্সি। অনেক টাকার কাজ।'

শুনে ফারুক একটু ধাক্কা খেলো, গলায় ভাত আটকে যাচ্ছে, সে পানি খেয়ে নিয়ে বললো, 'বাব্বা, বিরাট খবর।'

'কিন্তু দোস্ত, আমার প্যাকেজ সিনেমা তো শেষ করতে হবে, মৌসুমি নায়িকা। তোর হেল্প দরকার।'

'সিনেমার আমি কী বুঝি?'

'আরে সিনেমা না। আয় একটা আর্কিটেকচারাল ইন্‌জিনিয়ারিং ফার্ম দিই। তুই আমি আর রাহেল। আমি কাজ এনে দেবো। তোরা এক্সিকিউট করবি। প্রফিট লায়াবিলিটি সব তিনভাগে ভাগ হবে।'

'আমি কি পারবো?'

'না পারার কী আছে। চলে আয়।'

ফারুক মনে মনে হিসাব করছে, মোহন তার কাছেই এলো কেন? তার ছাত্রজীবনের দিনগুল মনে পড়তে লাগলো। ওরা আসলেই ভালো বন্ধু ছিলো। বহু রাত বুয়েটের শহীদ মিনারে, অডিটোরিয়ামে সিঁড়িতে ওরা আড্ডা দিয়েছে, ফারুক ওকে শোনাতো কবিতা, স্মৃতি থেকে, অবিরল। আর মোহন শোনাতো বিতর্কের স্ক্রিপ্ট।

মোহন বললো, 'দোস্ত, পাগলামি করিস না। না বলার কোনো মানে হয় না। সুবর্ণ সুযোগ।' ফারুকের চোখের দিকে সে তাকিয়ে থাকলো।

ফারুক মোহনের চোখে চোখ রাখলো। মোহনের ভিতরে এক ধরনের শিল্পী আছে। যদিও ক্রিয়েটিভ আর্টের চেয়ে পারফরমিং আর্টের দিকেই ওর ঝোঁক বেশি। শিল্পী তার সংঘ-সংশ্লিষ্টতা আরেক শিল্পীর সঙ্গেই করতে যায়। এক কবি সব সময় যায় আরেক কবির কাছে। মোহনের চোখে বন্ধুর প্রতি বন্ধুর টান। ছাত্রাবস্থায় ফারুক বন্ধুদের কাছ থেকে প্রচুর স্নেহ পেয়েছে, প্রশ্রয় পেয়েছে— আজো বন্ধুরা তাকে প্রশ্রয় দিতেই চায়। মা যেমন তার প্রতিবন্ধী সন্তানটির জন্যে মমতা পুষে রাখেন।

ফারুক বললো, 'ঠিক আছে, আমাকে কী করতে হবে।'

'তুই কাল আমার অফিসে আয়। কোম্পানি বানাতে হবে। আর্টিকেল অফ মেমোরেন্ডামে সইটই করতে হবে। তবে দোস্ত তুই যে পালিয়ে যাবি না, এটা আমি সারটেইন করতে চাই, তুই পাঁচলাখ টাকা দিবি। আমাকে না ব্যাটা, কোম্পানিকে।'

'টাকা? আমি টাকা পাবো কোথায়?'

'কোথাও না পেলে আমি ধার দেবো। তবে তুই পাবি। যোগাড় কর, বাসায় বল। তোর

www.shopnil.com

বোনের কাছে ধার নে। এক বছর লাগবে না। প্রফিট থেকে শোধ করে দিতে পারবি।'

ফারুকের মনে দ্বিধা। নিজের উন্নতির জন্যে টাকা চাইতে হবে!

মোহন বললো, 'ফারুক। তোর ওই রাতটার কথা মনে আছে! ওই যে ট্রাক এসে ট্রাফিক আইল্যান্ডটা উড়িয়ে দিলো।'

ফারুকের মনে পড়তে লাগলো। সেই রাতের কথা। মোহন অনেক মদ খেয়ে এসেছিল। তারা বুয়েটের মধ্যখানে দিয়ে বয়ে যাওয়া এশিয়ান হাইওয়ের মধ্যে একটা ট্রাফিক আইল্যান্ডে বসে ছিলো। ফারুক আর মোহন। ফারুক কবিতা পড়ছিল, মোহন শুনছিল। এক সময় দেখলো মোহন ঘুমিয়ে পড়েছে। মোহনকে কোলে তুলে সে নিয়ে গেলো শহীদ মিনারের সিঁড়িতে। তখন রাত দুটো হবে হয়তো।

হঠাৎ বিকট আওয়াজ। ফারুক দেখলো একটা ট্রাক এসে ধাক্কা দিয়েছে ট্রাফিক আইল্যান্ডটাকে। আইল্যান্ডটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে। মাত্র দুমিনিটের জন্যে তারা বেঁচে গেলো। আর দুমিনিট যদি ওই আইল্যান্ডে থাকতো, তা হলো মাংস-হাড়-রক্ত কিমা হয়ে যেতো। ঘুমজড়িত কণ্ঠে মোহন বলেছিল, 'ব্যাপার কী।'

মোহন বললো, 'দোস্ত, বেঁচে আছি। মরলে তো মরতাম একসঙ্গেই। একসঙ্গেই বেঁচে থাকি। চলে আয়।'

ফারুক রাজি হয়ে গেলো।

অপিকে নিয়ে পরের শুক্রবারই ফারুক চলে এলো কুঁড়েঘরে।

'দেখো, ঢাকার মধ্যে জলঢাকা। জলঢাকা চেনো? রংপুরের একটা জায়গা।'

অপি কিন্তু সত্যি সত্যি অবাক।

'কী খাবে? মনে হয় পান্তাভাত আর বিচিকলা খেতে হবে।' ফারুক রসিকতা করলো।

খেতে খেতে ফারুক বললো, 'বুঝলে জান, মোহনের প্রস্তাবটায় রাজি হয়ে গেলাম। এভাবে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে আর কতোদিন!'

ফারুক তাদের নতুন উদ্যোগটার কথা জানালো অপিকে। তারপর স্বপ্নভরা চোখে বললো, 'বোনের বাড়িতে বসে বসে আর কতদিন খাবো বলো। বিয়েশাদী তো করতে হবে।'

অপি এবার লজ্জা পেয়ে গেলো। এই প্রথম ফারুক নিজ থেকে বিয়ের কথা বলছে।

'বুঝলে অপি। এই প্রজেক্টটা শুরু হলে সামনের বছরই নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাবো। তোমারও মাস্টার্স ফাইনালটা হয়ে যাবে। বিয়ে করে ফেলবো।'

অপি কিছু বলছে না। মাথা নিচু করে চামচ দিয়ে ভাত মাখছে।

'কী। তুমি খুশি হওনি।'

হ্যাঁ। অপি খুব খুশি হয়েছে। ফারুক নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছে। নিজ পেশায় ফিরে যাচ্ছে। স্পঞ্জের চপ্পল পায়ে আর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে না। সে খুব ভালো হবে।

'আর তখন সত্যি সত্যি আমাদের একটা ঘর হবে। সতি সত্যি আমি বাবুই পাখির বাসার মতো করে সাজিয়ে দেবো। ইনটেরিয়ার ডেকোরেশনটা নিয়ে আমার কতোগুলো আইডিয়া আছে, তুমি শুনলে পাগল হয়ে যাবে।'

'না বাবা। বলো না। আমার পাগল হওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই।'

'দাঁড়াও, তোমাকে কতোগুলো বিদেশী বাড়ির ইনটেরিয়ার দেখাই।' ফারুক ওর ব্যাগ ঘেঁটে বই বের করলো।

অপি মন দিয়ে দেখলো। ফটোগ্রাফ। কী সুন্দর সুন্দর একেকটা বাড়ি। এই দেখো শোওয়ার ঘর। এখানে একটা ফ্লাওয়ার ভার্স। এই জানালা দিয়ে রাতে চাঁদের আলো এসে পড়বে।

স্বপ্ন স্বপ্ন। এমনি একটা ঘর তাদের হবে। তার আর ফারুকের। দুজন দুজনকে সারারাত জড়িয়ে ধরে থাকবে।

ফারুকদের নতুন অফিসটাও হলো দেখবার মতো। আর্কিটেকচারাল ফার্ম। তার চেহারাটা অনিন্দ্য সুন্দর না হলে চলে! ফার্মের নাম উঠোন। উঠোনের সব কিছু স্পেশাল। চেয়ার টেবিল কার্পেট ফোনসেট সিলিং সব। ফারুকের একটা নিজের ছোট্ট ঘর। ঘরটায় ঢুকলে মনে হয়, এক মেঘের ঘরে ঢুকে পড়লাম। ধূসর রঙের সব কিছু। টেবিলের পাশের র‍্যাকে একটা ছোটো ফ্রেম। তাতে অপির ছবি।

ফারুক ক্রমশ ব্যস্ত হয়ে পড়লো। ভীষণ কাজ। পুরুষ মানুষকে কাজ যখন ডাকে, তখন তাকে আর পায় কে! গভীর রাতে ফারুক ফোন করে অপিকে। রাতে কথা হয়।

সারাদিন হয়তো দেখাই হয় না।

অপি চিঠি লেখে ফারুককে। রাত জেগে জেগে লেখা লম্বা চিঠি। আবেগে থর থর।

মাঝেমধ্যে সেসব চিঠির দীর্ঘ জবাব আসে। ফারুকের লেখার হাত খুব ভালো। এমন গল্পের মতো করে লেখে। রূপকথার গল্প। সামনে অনার্স ফাইনাল। অপিও নিজেকে ডুবিয়ে রাখে পড়াশোনায়।

বহুদিন পর এক শুক্রবারে ফারুক খানিক সময় পেলো। তারা ঠিক করলো, আজ তারা যাবে টাঙ্গাইলে। একটা মাইক্রোবাস ভাড়া করে টাঙ্গাইলে গিয়ে খুঁজে বের করবে টাঙ্গাইল শাড়ির তাঁতীদের ঘর। ঘরে ঢুকে পছন্দ করে শাড়ি কিনবে।

সকালবেলা অপি তাই রেডি। একটা খদ্দরের ক্রিমকালার জামার ওপরে কালো তুলির হ্যাঁচর প্যাচর। (ফারুক তাকে বলেছে একটা শাড়িতে তুলি দিয়ে ছবি এঁকে দেবে।) তাতেই অপিকে দেখাচ্ছে খুব স্মার্ট। ফারুক এলো সকাল সকাল। বসলো না। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। দিন থাকতে থাকতে ফিরে আসতে হবে।

রিকশায় উঠে হঠাৎ ফারুক উশখুশ করতে লাগলো। একটু অফিসে যাওয়া দরকার। একটা গুরুত্বপূর্ণ কাগজ আছে। আজই একটা জায়গায় পৌঁছাতে হবে।

অপি বললো, 'উশখুশ করতে হবে না। সারাদিন শুধু শুধু কাজ আর কাজ। আজ ২৩ দিন পর আমরা একসঙ্গে বেরুচ্ছি। আজো কাজ তোমাকে ছাড়লো না।'

ফারুক অন্যমনস্কভাবে চচু চচু করতে লাগলো।

অপি বললো, 'আচ্ছা বাবা, চলো অফিসে। কাগজটা নিয়ে ফটোকপি করে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে যাই।'

ফারুক বললো, 'অফিস আজ বন্ধ। পিয়ন-টিয়ন পর্যন্ত নাই।'

www.shopnil.com

'তাতে কী! পিয়নের কাজ নিজেরা করলেও কোনো অসুবিধা আছে?'

'তা অবশ্য নেই।'

দুজন ওদের অফিসে গেলো। পল্টনের এক ভাড়াবাড়িতে অফিস। ফারুক পকেট থেকে চাবি বের করে দরজা খুললো। অপিকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলো। ভেতরটা অন্ধকার। হাতড়ে সুইচ টিপতে হলো।

নিজের ঘরে ঢুকে ফারুক কাগজ খুঁজছে। অপি ফারুকের চেয়ারে বসে দোল খেতে লাগলো। হি হি হি। দোল খেতে খেতে অপি নিজের মনেই হেসে উঠছে।

ফারুক তাকালো অপির দিকে। মেঘের গায়ে এই অপূর্ব সুন্দর মেয়েটা কে? মেঘেদের মেয়ে বিজলি রানি নাকি পরীর মেয়ে মেঘবতী।

ফারুক এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

অপি টের পাচ্ছে, মেয়েদের তিন নম্বর চোখ থাকে। কে তাকে দেখছে, কোন দৃষ্টিতে দেখছে— তারা ঠিকই বুঝতে পারে। অপি বুঝলো— ফারুক তাকে দেখছে, মুগ্ধতার চোখে, ভালোবাসার চোখে এবং সম্ভবত স্নেহেরও চোখে। অপি সোহাগে এলিয়ে পড়তে লাগলো, ভেতরে ভেতরে।

বললো, 'জানটু মানটু। কাছে এসো। আমার হাতটা ধরো।'

ফারুক এলো। চেয়ারের পেছনে দাঁড়ালো। অপির গলাটা পেঁচিয়ে ধরলো। তারপর মাথার ওপর দিয়ে মুখ নামিয়ে ওর ঠোঁটে চুমু খেলো।

অপির চুল এলোমেলো করে দিলো, তার চুলের মধ্যে মুখ গুঁজে গন্ধ শুকতে লাগলো। কণ্ঠার হাড়ে চুমু খেলো। ঘাড়ে চুমু খেলো। তারপর মেয়েটাকে টেনে কাছে নিয়ে দাঁড় করিয়ে আলিঙ্গনে বাঁধলো সজোরে। বুকের মধ্যে বুক রাখতে কী আরাম, পাঁচ মিনিট ধরে তারা আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে রইলো।

তারপর ফারুক বললো, এসো চুমুর বিশ্বরেকর্ড ভঙ্গ করি।

দুজনে মেঘরঙা কার্পেটে বসলো।

তারপর শুরু হলো দীর্ঘতর চুম্বনপর্ব। ফারুক ধরলো অপির ওপরের ঠোঁট। অপি পেলো ফারুকের নিচের ঠোঁট। তারপর ঠোঁটের ওপরতলা নিচতলার পারস্পরিক বদল। তারপর দাঁতে চুমু খাওয়া।

তারপর জিভ। এর মুখের মধ্যে ওর জিভ, ওর মুখের মধ্যে এর।

এক সময় ফারুক অপির জামার হুকে হাত দিলো। জটিল বোতাম।

ফারুক খুলতে পারবে না। অপি বললো, 'কী চাও।'

'তোমাকে দেখবো।'

'দেখছো না!'

'না, তোমার বুক দেখবো। বিশ্বাস করো, শুধু দেখবো। আর কিছু না।'

'সত্যি!'

'সত্যি।'

'জামাটা নিচ থেকে ওপরে তোলো?'

অপি জামার নিচটা উপরে তুলে ধরলো।

এতো সুন্দর। এতো সুন্দর। জ্যোৎস্না জ্যোৎস্না।

ফারুক কিছুই করলো না। শুধু তাকিয়ে রইলো।

সে মনে মনে আবৃত্তি করতে লাগলো রবীন্দ্রনাথ থেকে—

কোমল দুখানি বাহু শারমে লতায়ে
বিকশিত স্তন দুটি আগুলিয়া রয়—
তারি মাঝখানে কি রে রয়েছে লুকায়ে
অতিশয়-সযতন-গোপন হৃদয়।
দুইখানি স্নেহস্ফুট স্তনের ছায়ায়
কিশোর প্রেমের মৃদু প্রদোষকিরণে
আনত আঁখির তলে রাখিবে আমায়।

ওই দুটি ঘুঘুর দেহের মতো বুকের মাঝখানে হৃদয়। সে জায়গাতেই কি আমি আছি!

অপির জামা নামিয়ে দিলো ফারুক। পরম যত্নে। খানিকক্ষণ নীরব থেকে বললো, 'বিয়ে করেই আমরা বাচ্চা নিয়ে নেবো। কেমন! আচ্ছা বলো তো, যদি আমাদের একটা মেয়ে হয়, কী নাম দেবো তার।'

'তুমিই বলো।'

'অপরাজিতার মেয়ের নাম অপালা।'

'অপালা মানে কী?'

'কী জানি। মিথলজিকাল ক্যারেক্টার'।

'আর যদি ছেলে হয়।'

'তাহলে, তাহলে নাম দিও অপূর্ব না হলে অনন্ত।'

www.shopnil.com

রূপ-নারানের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ--

একদিন ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে অপি ঘোষণা করলো, 'জরুরি ঘোষণা, জরুরি ঘোষণা, আমার একটা ছোট্ট অপারেশন লাগবে, আমি এখন ক্লিনিকে যাচ্ছি। ভারি মজা, জীবনে প্রথম আমি অজ্ঞান হতে যাচ্ছি। হি হি হি।'

মামা বললেন, তাই নাকি, 'তাই নাকি। তাহলে তোর জন্যে ফল-ফ্রুট কিনে রাখতে হয়। জোয়ান মানুষের অনেক ডিউটি। কমলা আপেল আঙুর বেদানা। অপি, কিছু টাকাপয়সা দাও দেখি।'

মা বললেন, 'সব বিষয় নিয়ে ইয়ার্কি নয়। ব্যাপার কী? কী হয়েছে!'

অপি বললো, 'মা, ক্লাসে হঠাৎ করে পেটব্যথা শুরু হলো। তলপেটে, ডানদিকে। পয়েন্টেড ব্যথা। তার মানে তো অ্যাপেন্ডিসাইটিস। অ্যাপেন্ডিসাইটিস এখন ডাক্তারদের কাছে ডালভাত। ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্যে ডালভাত হচ্ছে। এই জমানায় এমন একটা মাইনর অসুখ নিয়ে ইয়ার্কি করব না তো কখন করব। ক্যান্সার-ট্যান্সার হয়ে গেলে তো ইয়ার্কি করে লাভ নেই।'

মামা বললেন, 'কে বলেছে ইয়ার্কি করে লাভ নেই। হাসি চিকিৎসার একটা সুফল নিশ্চয়ই আছে।'

মা বললেন, 'না বাপু, আমার কিন্তু সব বিষয়ে ইয়ার্কি ভাল্লাগে না। ব্যথাটা কি খুব বেশি?'

অপি বললো, 'আমি ঠিক জানি না। কারণ এরচেয়ে বেশি ব্যথা তো আমার পেটে কোনোদিন হয়নি।'

মা বললেন, 'ক্লাসে গিয়ে খিদে লেগেছে। পেট খালি। তারই ব্যথা। ভাত খা। ভাত খেলে ব্যথা ঠিক হয়ে যাবে।'

'দাও তাহলে ভাত দাও। আজকে কী রান্না হয়েছে মা!'

'নলা মাছ। আচ্ছা ঠিক আছে খেতে বস। ডিম ভেজে এনে দিচ্ছি।'

'ডাল আছে তো মা। ডালভাত খেয়ে গিয়ে ডালভাত অপারেশনের জন্য তৈরি হই।'

বিকেলবেলা ব্যথাটা আরো তীব্র হয়ে উঠলো। অ্যাপেন্ডিসাইটিসের আদর্শ মেনে ওঠা ব্যথা। তলপেটে ডান দিকে। সন্ধ্যার দিকে কমে এলো ব্যথাটা।

এমনটা ইদানীং মাঝেমধ্যেই হচ্ছে। লক্ষণ ভালো নয়। হঠাৎ আপেন্ডিসাইটিস বার্স্ট করে মরে গেলে সব শেষ। তখন কেঁদে কেটেও লাভ হবে না। হায় জীবন এতো ছোট কেনে গান গাইতে হবে— কবরে গিয়ে।

এই খেদ মোর মনে মনে
ভালোবেসে মিটলনা আশ- কুলাল না এ জীবনে।

হায়! জীবন এতো ছোট কেনে!

সে মরে গেলে ফারুক একা একা কী করবে! অপির মনে পড়ে গেলো সেই কৌতুক— 'হ্যাগো, আমি মরে গেলে তুমি কী করবে?

'পাগল হয়ে যাব।'

'আবার বিয়ে করবে না তো?'

'বলা যায় না, পাগলে কীনা করে।'

পুরুষগুলোকে বিশ্বাস নেই। হয়তো কবরের পাশে বসে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করে মাটি শুকুবে।

বাবার এক বন্ধু আছেন সার্জন। অপি বললো, 'বাবা, তোমার বন্ধুকে কি তোমার মাঝেমধ্যে দেখতে যাওয়া উচিত নয়?'

'নিশ্চয়। কোন্ বন্ধু।

'ডাক্তার হাসান আঙ্কেলকে!'

'ডাক্তারের কাছে ঘনঘন যাই, এই দোয়া কি ভালো দোয়া হলো।'

'তা না। তবে আপাতত আমি তার কাছে যেতে চাইছি। পেটে সামান্য ব্যথা দেখা দিয়েছে। তুমি কি একটু ফোন করে দেবে?'

'ঠিক আছে দিচ্ছি। সঙ্গে কে যাবে?'

'মামাকেই নিয়ে যাই। জোয়ান মানুষ সঙ্গে থাকা ভালো। মামা ভাগ্নি যেখানে, আপদ নাই সেখানে।'

বাবা ফোন করে দিলেন। পরদিন বিকেলবেলা। অপি দেখা করলো ডাক্তার হাসানের সঙ্গে। খুবই ভালো মানুষ এই ডাক্তার। নানা গল্প করেন। মা মা করে ডাকেন। বললেন, 'মা, তুমি কি দিলখোলা ধরনের মেয়ে, নাকি পেটে কথা জমা করে রাখ।'

'জি। বুঝতে পারছি না।'

'না। বলছিলাম কী, মনে হয়, পেটের মধ্যে কথা চেপে রেখে আবার ব্যথা বানাও নি তো। মেয়েরা সাধারণত পেটে কথা রাখতে পারে না। তাই তাদের ব্যথা-বেদনা হয় না।

এই টেস্টগুলো একটু করাও।'

টেস্ট করা হলো। জরুরি ভিত্তিতেই। সব কিছু দেখে ডাক্তার বললেন, 'মা, আমার কেন যেন মনে হচ্ছে অ্যাপেন্ডিসাইটিস নয়। তুমি মা একটু ডাক্তার আলীর কাছে যাও। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি।'

ডাক্তার আলী লোকটা গম্ভীর ধরনের। কোনো কথা বলেন না। আরো কিছু টেস্ট এক্সরে তিনি করতে দিলেন।

সে সবের রিপোর্ট নিয়ে মামা-ভাগ্নি ফের গেলো তার কাছে। তিনি আরো গম্ভীর হয়ে

www.shopnil.com

বললেন, 'পেসেন্টের কি টিবির হিস্ট্রি আছে?'

মামা আমতা আমতা করছেন। অপি বললো, 'আছে। সে অনেক ছোটো থাকতে। তখন আমি ক্লাস ওয়ানে পড়ি।'

ডাক্তার বললেন, 'আরেকটা টেস্ট করতে চাই। এ জন্যে ক্লিনিকে ভর্তি হতে হবে।'

মামা বললেন, 'কবে ভর্তি হতে হবে?'

ডাক্তার বললেন, 'কাল-পরশু....., আপনাদের সুবিধা মতো।'

মামা তোতলাতে শুরু করলেন, 'ডিজিসটা কি সি-সি-রিয়াস!'

ডাক্তার অতিভারিক্কি গলায় বললেন, 'ডিজিজটা ধরার জন্যে একটা টেস্ট করতে হবে। তার আগে কিছুই বলা যাচ্ছে না।'

হাসিবাড়ির হাসি-ঠাট্টা এবার একটু করুণ হয়ে পড়লো। এ কয়েকদিন অপি বাসায় ফিরেছে আর অভিনয় করে দেখিয়েছে, কোন ডাক্তার কীভাবে কথা বলেন। কার হাতের লেখা কেমন। কার চুলের ছাঁট মিস্টার টি-য়ের মতো। প্রথম দিন ডাক্তার আলীকে দেখে সে বলেছিল, এতোটুকু যন্ত্র হতে এতো শব্দ হয়। দেখতে তিনি চার্লি চ্যাপলিন, শুধু গোঁফটা নেই, কিন্তু গলার আওয়াজ ঠিক যেন অমিতাভ বচ্চন।

আজ এসে বললো, 'আবার হাসির স্কুল খোলো। ক্লিনিকে ভর্তি হতে হবে। হিহিহি।'

তার হাসি দেখে সবাই গম্ভীর হয়ে গেলো। সে বললো, 'কী ব্যাপার। তোমরা সবাই হাসিঠাট্টা ভুলে গেলে মনে হচ্ছে। রিফ্রেশমেন্ট কোর্স করতে হবে।'

পরদিন বাবা নিজে গেলেন ক্লিনিকে। ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ করতে। ফিরে এসে মাকে বললেন, 'কী একটা টেস্ট নাকি করবে, ল্যাপরোস্কপি। ভর্তি করতেই হবে। বুকের ভেতরটা কেমন করছে। খুবই কেমন কেমন!'

মা বললেন, 'তুমি ভেঙে পড়ো না। মেয়েটার সামনে হাসিখুশিই থাকো। তোমার মনখারাপ দেখলে ওর মনটা কেমন খারাপ হবে।'

ক্লিনিকে ল্যাপরোস্কোপি হয়ে গেলো। পেটের মধ্যে একটা ছোট্ট ছিদ্র করে ভেতরের অবস্থা যন্ত্রপাতি দিয়ে দেখা। তারপর ডাক্তার বললো, 'ঠিক আছে, সব ঠিক, মিস অপরাজিতা হক, আপনি এখন যেতে পারেন।'

শুনে অপি ফিক করে হেসে দিলো। এ জীবনে এ-প্রথম সে মিস অপরাজিতা হক সম্বোধন শুনলো। ষাট দশকের সিনেমায় এ-রকম ডায়লগ শোনা যায়।

এরপর সব ঠিকঠাক। হাসিবাড়ি আবার হাসিতে উজ্জ্বল। একদিন তাদের ড্রয়িংরুমে আয়োজন করা হলো দাদির একক সঙ্গীতানুষ্ঠান। দাদি হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইলেন। অনুষ্ঠানে অবশ্য বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল ফারুক আবদুল্লাহর, তিনি কিন্তু আসতে পারলেন না। খুবই ব্যস্ত। বিল্ডিঙের নক্শা আঁকছেন।

অপির সঙ্গে অবশ্য টেলিফোনে কথা হয়। যদিও সারারাত টেলিফোনে কথাবলার সর্বশেষ ঢাকাই ফ্যাশনের সঙ্গে তারা তাল মেলাতে পারছে না। কারণ ফারুক সত্যি সত্যি ব্যস্ত। গভীর রাত পর্যন্ত ডিজাইনের কাজ করে, আবার সকালে উঠে অফিস যেতে হয়।

অপি বলে, ভালোবাসলাম ব্যাঙকে, এ যে হতে চাইছে রাজকুমার। না বাবা, আমার ব্যাঙই ভালো ছিল। আমাকে ২৪ ঘণ্টা সময় দিতো।

নিজের মহাসমারোহে ক্লিনিকযাত্রা এবং বীরবিক্রমে ফিরে আসার গল্প অপি বিস্তারিত জানালো ফারুককে। বললো, 'জানো, একটা রানও করতে পারিনি। ব্যাট নিয়ে গেলাম আর ফিরে এলাম।'

'মানে কী?'

'মানে হলো, ডাক্তার বললেন, কোনো রোগ নেই। মিস অপরাজিতা হক, আপনি বাসায় ফিরে যেতে পারেন। হিহিহি।'

'এতো বড়ো ঘটনা তুমি আমাকে জানাওনি কেন?'

'শোনো। পত্রিকায় দেখেছো, চাঁদপুরে কী ঘটেছে। স্টুল ছিনতাই। এক লোক প্যাথলজিকাল ল্যাবরেটরিতে যাচ্ছে স্টুল টেস্ট করাতে। ব্যাগের মধ্যে স্টুল। রাস্তায় ধরলো ছিনতাইকারী। যা আছে দিয়ে দাও। লোকটা ব্যাগ দিয়ে দিলো। চিন্তা করো, ছিনতাকারী পরম আগ্রহে ব্যাগ খুলছে। তারপর তার অবস্থা কী হলো! হিহিহি। আমি তো ভাবলাম, একটা কিছু ঘটুক। তারপর তোমাকে খবর দেব। ওগো। আমার ক্যান্সার। তুমি এসো। তোমার কোলে মাথা রেখে আমি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করি। কিন্তু সেসব কিছুই না। হয়তো হজমের গন্ডগোল। তাতেই কীনা কী টেস্ট করালো। যন্ত্রপাতি এসেছে তো। অ্যাপ্লাই করার লোক চাই।'

'এই খরবদার। নিষ্ঠুরের মতো কথা বলো না। আমার চোখ কিন্তু ছল ছল করছে।'

'তুমি যা না। একেবারে চিকেন হার্টেড।'

'আর তুমি কি লায়ন হার্টেড। তাতো হবেই। তোমার হার্টে তো আমি, আর আমার হার্টে তো তুমি।'

'অ্যাই আমাকে চিকেন বলছ। কান মলে দেব।'

'দাও।'

'টেলিফোনে!'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তো বেঁচেই গেলে। হাতটা আর কান পর্যন্ত পৌঁছালো না। নাও একটা কান মলা।'

'মলেছ!'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে নাও তার দাম।' ওপারে চুমুর শব্দ হলো। অপি বললো, 'ডু।'

সেই রাতে একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটলো। পরীক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে অপি একটু রাত জেগেই পড়ে। রাত একটার দিকে সে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে। ঘুম আসছে না। মনে হচ্ছে, ফারুক তো জেগেই আছে, একবার ফোন করতে যাবে কিনা। ওর কাজের ব্যাঘাত ঘটবে ভেবে আর উঠলো না। চোখে একটু তন্দ্রামতোও এসেছিল। হঠাৎ ঘুম ভাঙলো। কে যেন কপালে চুমু দিচ্ছে।

চোখ মেলে বুঝলো মা। কিন্তু সে ঘাপটি মেরেই পড়ে রইলো। ডিম লাইটের মৃদু আলোতেও সে বুঝলো মায়ের চোখে জল! ব্যাপার কী? মা বিছানার পাশে খানিক দাঁড়িয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। কান্না গোপন করার জন্যে তিনি ঘর ছেড়ে গেলেন দ্রুতপায়ে। অপির মনে একটা প্রশ্ন খচখচ করতে লাগলো। কোথাও একটা গোলযোগ হয়ে গেছে? কোথায়?

www.shopnil.com

পরদিন মামা এলেন তার ঘরে, 'মা মণি, তোমার জোয়ান ছেলে একটা বিপদে পড়েছে। পঞ্চাশটা টাকা দেওয়া যাবে। ধার। খুব বিপদে পড়েছি।'

'কী বিপদ?

'রিকশায় চড়ে এক জায়গায় গিয়েছি। পাওনা টাকা আনতে। গিয়ে দেখি ব্যাটা নেই। এখন রিকশাভাড়া দেই কেমন করে। এক বেবিট্যাক্সিঅলার কাছ থেকে টাকা ধার করে বিকশাঅলাকে দিলাম। ওই বেবিট্যাক্সিতে আসছি। রাস্তায় সেটা খারাপ হয়ে গেলো। আরেকটা বেবিট্যাক্সিঅলার কাছে থেকে ২৫ টাকা ধার করে ওকে দিলাম। এখন শেষ বেবিট্যাক্সি নিচে দাঁড়িয়ে আছে। ৫০ টাকা পায়।'

'দেবো। তবে একটা শর্ত। আমি একটা প্রশ্ন করবো। তুমি ঠিক ঠিক জবাব দেবে।'

'নিশ্চয় দেবো।'

'জেনেশুনে সত্য গোপন করবে না।'

'আলবত না।'

'ঠিক আছে। স্কুটার ভাড়া দিয়ে আসো।' ৫০ টাকা দিলো তাকে অপি।

'এখন বল, কী তোর সওয়াল।'

'আমার অসুখটা কী? ক্যান্সার?'

'না।'

'তাহলে কী?'

'কোনো অসুখ না।'

'নিশ্চয় কোনো অসুখ। সিরিয়াস অসুখ।'

'ব-ব-বলছি তো অ-অসুখ না।'

'মিথ্যা বলো না। তোতলাচ্ছো কেন?'

'বলবো?'

'হ্যাঁ'

'আসলে তোকে তো জানাতে হবেই। তোর অসুখ। তুই জানবি না। অ-অ-সু-খটার নাম টিউব ব্লকেজ। মেয়েলি অসুখ, ইউটোরস ডিসপ্লেসড হয়ে গেছে। নেমে গেছে। টিউব ব্লক হয়ে গেছে।'

'এতে কি আমি মরে যাবো?'

'না। মরে যা-যা-বি কেন? বেঁ-বেঁ-চে থাকবি। শতায়ু হবি। শুধু বি-বিয়ে করতে পারবি না। না-না, বি-বিয়ে করতে পারবি। বাচ্চা-কাচ্চা হবে না। না হোক। মডার্ন এজ। হু ডাজ ওয়ান্ট কিড্স। নাহ্। হো হো হো হো হো।'

অপিও হাসতে লাগলো। হিহিহিহি। থ্যাংক ইউ। যাও মামা। সামনে আমার পরীক্ষা।

তারপর ওলটপালট হয়ে গেলো সমস্ত চরাচর, মনে হলো সবকিছু উল্টে গেছে, খাট-টেবিল-চেয়ার ছাদে,পা ওপরে, মাথা নিচে, আর ফ্যানটা মেঝেতে, পানি নিচ থেকে ওপরের দিকে যাচ্ছে, ধোঁওয়া ওপর থেকে নিচের দিকে নামছে। সে নিজে ঝুলে আছে ছাদে, ছাদের সঙ্গে পা, মাথা নিচের দিকে। তারপর অন্ধকার হয়ে এলো চারপাশ, ঝাপসা হতে হতে।

খানিকক্ষণ ঝিম ধরে পড়ে থেকে সে উঠলো। বাসার সবাই টিভি দেখছো কেব্‌ল লাইনে নানা মজার জিনিস দেখা যায়।

অপি ঘরে একা! সে বাথরুমে গেলো। মাথায় পানি ঢাললো অনেকক্ষণ। মাথা মুছে টেবিলে মাথা ঠেকিয়ে ধাতস্থ হওয়ার চেষ্টা করলো। না। স্বাভাবিক হওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু তাকে হতে হবে। সে হাসিবাড়ির মেয়ে।

এখন আমার কী করা উচিত? এখন আমার কী করা উচিত! তার খুব হাসি পাচ্ছে। তার ছয় বছর বয়সে কাশি হয়েছিল। ওটা যে টিবি সেটা বুঝতে একটু সময় লেগে গিয়েছিল। তারপর যথারীতি চিকিৎসা শুরু হলো। তখন তার বয়স কম। আর রোগটা তেমন ভয়ানক কিছু নয়। সবাই তাই বলেছে। হা অদৃষ্ট। তখনই তার শরীর তার সীমানা বেঁধে দিয়েছে।

অপি একটা মহিলা পত্রিকার স্বাস্থ্য পাতায় চিঠি লিখলো। টিউব ব্লকেজ কী! তারপর অপেক্ষা। এই সময়ে সে রইলো যথাসম্ভব স্বাভাবিক। হাসিখুশি। সবাইকে বলে দিয়েছে, আমার পরীক্ষা নিয়ে আমি খুবই ব্যস্ত। ফার্স্টক্লাস পাবো— এই আমার পণ। আমাকে কেউ জ্বালাবে না। ডিস্টার্ব করবে না। ফারুককেও সে বলে দিলো একই কথা। ফারুক নিজেও ব্যস্ত তার কাজ নিয়ে। মাঝেমধ্যে ফোনে মিনিট পাঁচেক কথা— এই সব।

তারপর বেরুলো সেই চিঠি আর তার জবাব। বিয়ে করতে পারেন, তবে সন্তান হবে না। সাইকোলজিক্যাল রিফিউজাল থেকে দাম্পত্যজীবনে জটিলতা হতে পারে। ফিজিকালিও পেইনফুল হতে পারে। এদেশে চিকিৎসা নেই। বিলাতে অপারেশন করা হয়। সাকসেসের সম্ভাবনা ১ ভাগেরও কম।

গভীর রাত। বিছানায় শুয়ে আছে অপি। তার ঘুম আসছে না। সে এপাশ ওপাশ করছে।

ফারুকের মতো সংসার-বিগী ছেলে গোছানো-গোটানো হয়েছে, তাকে বিয়ে করে সন্তানের মুখ দেখবে বলে।

বাচ্চার নাম কী হবে, তাও সে ঠিক করে রেখেছে।

তার বোন, তার দিকে চেয়ে আছে, একটা বাচ্চার আশায়।

তার মা বংশের প্রদীপ থেকে জ্বেলে যেতে চান আর একটা প্রদীপ। এ অবস্থায় সব জেনেশুনে কেন অপি বোঝা হবে ফারুকের ঘাড়ে! সে না ফারুককে ভালোবাসে! বড়ো প্রেম শুধু কাছেই টানে না, উহা দূরেও ঠেলিয়া দেয়। আজ অপিকে তার ছোট্ট দুটো কাঁধে নিতে হবে বড়ো প্রেমের বড়ো দায়িত্ব। সে ফারুককে মুক্তি দেবে। দেবেই। হাসিবাড়ির কাউকে তার পরিকল্পনা বলার দরকার নেই। তার পথ তাকেই বইতে হবে। মানুষ বড়ো একা। মানুষ তার চিবুকের কাছেও বড়ো একা। অপির চোখ মুখ বুক গলা ভেঙে কান্না আসতে চায়। কিন্তু কাঁদলে তো চলবে না। কাঁদলে তো তার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা যাবে না। তাকে হাসতে হবে। বুকের মধ্যে কষ্টগুলোকে পাথর বানিয়ে তাকে হাসতে হবে।

পাশের বিছানায় দাদি ঘুমোচ্ছেন। অপি উঠে বসলো। নিজের ড্রয়ার থেকে বের করলো

www.shopnil.com

ফারুকের দেওয়া প্রথম উপহার—ঝিনুকগুলো। ঝিনুকগুলো হাতে করে নিয়ে সে আবার শুয়ে পড়লো বিছানায়। বালিশে মাথা দিয়ে বালিশের পাশে ঝিনুকগুলো রেখে, সে নাড়তে লাগলো। তার মনে পড়লো আবুল হাসানের বহুল উদ্ধৃত কবিতার পংক্তি—

ঝিনুক নীরবে সহো ঝিনুক নীরবে সহে যাও
ভেতরে বিষের বালি মুখে বুঁজে মুক্তো ফলাও।

ফারুক নামে তার কেউ ছিল না, ফারুককে সে চেনে না, ফারুককে তার ভালোবাসার প্রশ্নই আসে না।

'For you was I born, for you do I have life,
for you will I die, for you am I now dying'

বাসায় অপি কড়া নির্দেশ জারি করলো— সামনে তার পরীক্ষা, এবার ফার্স্টক্লাস তাকে পেতেই হবে। অতএব, সে এখন ১৮ ঘণ্টা পড়াশুনা করবে, নাওয়া-খাওয়া গল্প-গুজব ইত্যাদিতে সময় যতো কম অপচয় করা চায় ততোই ভালো।

ফারুকের টেলিফোন এলো রাতে। এই ভয়ই সে পাচ্ছিলো। টেলিফোন বাজছে, কেউ ধরছে না, কারণ সবাই জানে— এটা অপির ফোন। মামা এসে বললেন, 'এই অপি, ফোন ধরছিস না। ব্যাপার কী?'

অপি বললো, 'মামা, তুমি ধরো। বলো আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। পরীক্ষার মধ্যে এ সব ভাল্লাগে না মামা।'

'তুই গিয়ে বল তুই ঘুমিয়ে পড়েছিস'— মামা হাসলেন।

অপি গেলো ফোনের কাছে। ব্যাপারটার ফয়সালা তাকেই করতে হবে। দক্ষতার সঙ্গে, ঠাণ্ডা-রক্ত খুনির মতো, চোখের পাতাও কাঁপবে না।

সে ফোন তুললো।

'হ্যালো জান, কী করছিলে!'

অপি বললো, 'ফারুক। আমি ঠিক করেছি পরীক্ষাটা সিরিয়াসলি দেবো। আমার পরীক্ষার আগে আমি এক মিনিট সময়ও নষ্ট করতে চাই না। তুমি যদি আমাকে সহযোগিতা করো, ভালো হয়।'

'কীভাবে?'

'ফোন না করে।' অপি ফোন রেখে দিলো।

সেই কণ্ঠস্বর, সেই ভালোবাসা মমতায় ভরা প্রতিটি শব্দ, শ্বাস-প্রশ্বাস। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রতিটা মুহূর্ত প্রতীক্ষা করে এই একটা ফোনের জন্যে, তার একটু কথা শোনার জন্যে, তাকে একটু ভালো করে দেখার জন্যে, তার স্পর্শ লাভ করার জন্যে। অপির বুকের ভেতরটা কেটে ছিঁড়ে ছেঁচে থেতলে রক্তে-মাংসে একাকার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এতো সহজেই ভেঙে পড়লে তো চলবে না।

মনকে শক্ত করো, কঠিন করো।

আবার রিং হচ্ছে। সে জানে, ফারুক আবার ফোন করবেই।

অপি ফোন তুললো, 'হ্যালো, জান তোমার কী হয়েছে? বলো তোমার কী হয়েছে।'

www.shopnil.com

'কিছু হয়নি। পরীক্ষার জন্যে সিরিয়াস হয়ে উঠেছি। তোমাকে যে বললাম ফোন করবে না। করেছো কেন?'

অপি ফোন রেখে দিলো।

খানিকপর রিসিভার তুলে রেখে দিলো। লাইন কেটে আবার ডায়াল করার চেষ্টা করলো ফারুক। আবার, আবার। না, লাইন পাওয়া যাচ্ছে না। ধুত্তোরি।

প্রথমে উদ্বিগ্ন, তারপর ক্ষিপ্ত, তার অভিমানহত হলো ফারুক। ঠিক আছে, আমি ফোন করবো না। দেখা যাবে, তুমি ফোন না করে পারো কিনা।

কাজে আর সে রাতে মন বসাতে পারলো না।

বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লো।

একদিন দুদিন তিনদিন যায় অপি ফোন করে না। না করুক না করুক। নিজের কাজে ভুল হয়ে যায়, ড্রয়িং বাঁকা হয়ে যায়। অফিসে সিটে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে থাকে ফারুক। না, আমি আগে ফোন করবো না। দেখা যাক, ও করে কিনা।

ফোন আসে না, ফোন আসে না। প্রতীক্ষাতে প্রতীক্ষাতে সূর্য ডোবে, রক্তপাত হয়। সিগ্রেট ধরায় ফারুক। তামাকের গন্ধ সহ্য হয় না, জিভ তেতো হয়ে আসে, তবু খায়। রাতে শুতে যায় ঘুমের ওষুধ খেয়ে। শুক্রবার সকালে উঠেই মনে হয়— না, আজ অপির বাসায় যেতে হবে। ভালোবাসায় মান-অভিমান তো থাকবেই। নিজে থেকে গিয়ে ওকে ডাকলেই তো সব মিটে যায়।

অপির সঙ্গে দেখা হবে, কথা হবে— এসব ভাবতেই তার মনটা প্রশান্তিতে ভরে উঠলো।

সে তাড়াতাড়ি হাসিবাড়ির দিকে রওনা হলো।

হাসিবাড়ির লোকজন তাকে দেখে সবাই অবাক। 'অপি তো ভোরবেলা উঠেই বাইরে গেছে। তোমাদের ওখানে যায়নি?'

'না তো! কোথায় গেলো? কিছু বলে গেছে?'

খানিকক্ষণ বসে ফারুক উঠে পড়লো। একা একা হাঁটতে লাগলো। আজ হেঁটে হেঁটে ঢাকা শহরটা দেখে ফেলবে।

রোদ উঠেছে। গা চিটমিট করছে। যদি এমন হয়, অপি তাদের বাসায় গিয়ে বসে আছে। তাড়াতাড়ি বেবিট্যাক্সি নিয়ে সে বাসায় এলো।

না। কোথায় অপি?

বাসাতেই তো থাকা ভালো। যদি সে আসে।

খানিকক্ষণ পর পর ফোন করে খোঁজ নিচ্ছে, হাসিবাড়িতে অপি ফিরেছে কিনা।

অপি সারাদিন কাটালো তার এক সহপাঠিনীর বাসায়। ফিরে এলো রাত ন'টায়।

'কী ব্যাপার কোথায় গিয়েছিলি?' মা জিজ্ঞেস করলেন।

'শান্তাদের বাসায়।'

'বলে যাবি না। আমরা চিন্তায় চিন্তায় অস্থির। ফারুক বারবার এসে খোঁজ নিয়ে গেলো। রাত দশটায় ফোন এলো।

অপি কী করবে? তার ফোন তো তাকেই ধরতে হবে। তার সমস্যার পুরো বাড়িতে

জড়িয়ে কী লাভ!

ফোন ধরে অপি ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'তোমাকে কি আমি বলেছি তুমি আর ফোন করবে না?'

'তুমি বলবে তো আমার অপরাধটা কী!'

অপি ফোন রেখে দিলো। ফোনের তার খুলে রাখলো।

সারারাত অপির ঘুম এলো না। চুপ করে চোখ বন্ধ করে রইলো। বালিশের পাশে ঝিনুক ক'টা, বাইরে সময় একটু একটু করে গাড়িয়ে যাচ্ছে, শ্লথ ভঙ্গিতে, একেকটা মুহূর্তের চলে যাওয়া সে দেখতে পাচ্ছে। কামিনী ফুলের ঝাড় থেকে মাদকতাময় গন্ধ আসছে, পাখিরা পাখা ঝাপটাচ্ছে বাগানে। দুটো বিড়াল ঝগড়া করছে, হুল্লোড় করে। কাঁদতে বসলো বিড়াল দুটো। মানবশিশুর মতো হৃদয়-ছিঁড়ে ফেলা কান্না। অপি চোখকে পাথর বানিয়ে রাখলো। একফোঁটা অশ্রু সে ফেলবে না। এখন তার ভেঙে পড়ার সময় নয়।

পরদিন অপি ইউনিভার্সিটি যাবে বলে বেরিয়েছে। রিকশায় উঠতেই কোথা থেকে ফারুক এসে সোজা তার পাশে বসে পড়লো।

অপি বললো, 'কী ব্যাপার?'

ফারুক, 'বারে। তোমার পাশে আমি বসবো। তাতে আর ব্যাপার কী?'

অপি বললো, 'এসেছো খুব ভালো করেছো। চলো তোমার সঙ্গে সিরিয়াস কথা আছে!'

ফারুকের বুকটা টিপটিপ করতে লাগলো। ফারুক বললো, 'সিরিয়াস কথার দরকার নেই। চলো আমার অফিস চলো'।

'না।'

তারা একটা রেস্তরাঁয় বসলো। প্রায়ান্ধকার ঘর। তারা বসেছে মুখোমুখি।

অপি বললো, 'কথা খুব সংক্ষিপ্ত। আমি চাই না তোমার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক থাকুক। এমনি দেখা হলে কেমন আছো, ভালো আছো চলতে পারে, তার বেশি কিছু নয়।'

ফারুক কাঁদতে লাগলো। তার দুচোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে। গলা থেকে বিকৃত বিলাপ বেরিয়ে আসছে। কান্না চাপতে গিয়ে তা গোঙানির রূপ নিলো।

ফারুক বললো, 'কেন, জানতে পারি?'

'তোমাকে আর আমার ভালো লাগে না।'

ফারুক কান্না থামিয়ে হাসলো, 'রসিকতা করো না তো। কে কী বলেছে। বলো।'

অপি বললো, 'দেখো। আমি খুব সিরিয়াস। তুমি আমাকে ফোন করবে না। আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করবে না। দিস ইজ ফাইনাল।'

'কেন জান, কেন?' অপি চুপ কর রইলো। তাকে দেখাচ্ছে আগুনে তাঁতানো ধাতব ভাস্কর্যের মতো।

'অপি, জানসোনা, শুধু বলো, কেন এমন করছো?'

'সেটা আমার পার্সোনাল ব্যাপার।'

www.shopnil.com

'তোমার কি অন্য কাউকে ভালো লেগেছে?

'সেটা আমার পার্সোনাল ব্যাপার?'

'তোমার আমার মধ্যে পার্সোনাল ব্যাপার কি আদৌ আছে!'

'কেন। কী এমন সম্পর্ক। পরম ভালোবেসে বিয়ে করে ১৮ বছর সংসার করার পর অন্যের হাত ধরে একেকজন বেরিয়ে যায় না? মানুষের মন খুব বিচিত্র।'

ফারুক আবার কাঁদতে শুরু করলো। বললো, 'তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না।'

অপি বললো, 'না বাঁচলেও আমার করার কিছু নাই। আমি খুব খারাপ মেয়ে ফারুক। তোমার মতো ভালো ছেলে কেন আমার জন্যে জীবন নষ্ট করবে।'

'না না। তুমি এই দুনিয়ার সেরা মেয়ে। সেরা হও, নাই হও, তুমি আমার।'

'না। কেউ কারো নই। তোমাকে সোজা কথা বলি। দিস ইজ মাই ফাইনাল ওয়ার্ড। তুমি আর বাসায় ফোন করবে না। আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে না, তুমি যদি আর একবারও আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করো, রাদ-শাদের কিরা, আমি গলায় ফাঁসি দেবো। উঠি।'

বেয়ারারা সব কৌতূহলী চোখে দূর থেকে তাকিয়ে আছে। এখানে নাটক করার মানে হয় না। খাবারের বিলও দেওয়া হয়নি। গমনরত অপির পিছে আর ধাওয়া করা হলো না ফারুকের। সে ভাবলো, পরে আবার চেষ্টা করা যাবে।

সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে টিভি রুমের আড্ডায় অপি বললো, 'সবাই একটা কথা শোনো। ফারুকের সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক নাই। তোমরা কেউ ওর ফোন ধরবে না। ও এলে দরজা খুলে দেবে না।'

পুরো ঘর স্তম্ভিত হয়ে গেলো। অপির চোখমুখ খুব কঠিন। কেউ তাকে কোনো প্রশ্ন করার সাহস পেলো না।

অপি সারাদিন বাইরে বাইরে থাকে। আজ সহপাঠিনীর বাসায়, কাল অমুক খালার বাসায়। যে আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নিতান্ত যোগাযোগের অভাবে মরে গিয়েছিল, সে তাদের বাসায় সকালবেলা বই-খাতা নিয়ে হাজির হয়। আমি সারাদিন থাকবো। পড়ে-টড়ে রাতে যাবো।

রাতে বাসায় ঢুকে সে প্রথমেই ফোনটার প্লাগ খুলে রাখে।

এর মধ্যে ফারুক দুইবার তাদের বাসায় হানা দিয়েছে। তাকে পায়নি। বাসার কেউ ফারুকের সঙ্গে আগের মতো সহজ ব্যবহারও করেনি। কোথায় যেন তার কেটে গেছে।

অপি বললো, 'আমি কয়েকদিন নানুর বাড়িতে গিয়ে থাকতে চাই। মামা, তুমি কি আমাকে পৌঁছে দেবে।'

নানুর বাড়ি ময়মনসিংহ।

মামাকে সঙ্গে নিয়ে স্যুটকেস বেঁধে অপি গেলো ময়মনসিংহ। স্যুটকেসে অল্প কিছু জামা আর বইপত্র। হাতব্যাগে টাকা, টুকিটাকি জিনিস আর কতোগুলো ঝিনুক।

ফারুকের এই দিনগুলো যে কেমন করে গেলো। একদিকে অফিসে কাজের প্রচণ্ড চাপ। অন্যদিকে মানসিক পীড়ন। অপিসোনা, কেন তুমি আমাকে ছেড়ে যাচ্ছো। আমার কী অপরাধ বলো, তুমি আমার কাছে কী চাও! আমি তোমার জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত। সব ছাড়বো। বুবুর বাসা ছাড়বো। এই ফার্ম ছাড়বো। যদি বলো, আবার ইউনিভার্সিটি ভর্তি হবো। মাস্টার্সে ফার্স্ট হবো। স্কলারশিপ নিয়ে অ্যামেরিকা-কানাডা যাবো। যদি বলো কিছুই করবে না। তুমি আর আমি যে কায়া-আর ছায়ার মতো। কী করে তোমাকে ছাড়া আমি থাকবো, আমাকে ছাড়া তুমি।

তার অবস্থা দেখে মোহন হাসে। দোস্ত, তুই যে দেবদাস হয়ে গেলি রে। ফরগেট এণ্ড ফরগিভ। ক্ষমা করে দে।

ব্লাক লেভেলের বোতল থেকে গ্লাসে ঢেলে মোহন বলে, 'নে একটু খা।'

ফারুক খায়, বুক জ্বলে যায়। তবু খায়। খেতে ভালো লাগে। মনে হয়, ভালোবাসা, আমি তোমার জন্যে সব কিছু করছি। তোমার জন্যে আমি জন্মেছিলাম, তোমার জন্যেই আমি প্রাণ পেয়েছি, তোমার জন্যেই আমি মরবো আর তোমার জন্যেই মরছি।

একমাস ময়মনসিংহে কাটিয়ে অপি ফিরে এলো ঢাকায়, হাসিবাড়িতে।

নিজঘরে ঢুকে দেখতে পেলো, তার টেবিলের ওপর খামের স্তূপ। প্রায় ৯০টি চিঠি। প্রতিদিন তিনবেলা তিনটা করে চিঠি ফারুক লিখেছে।

অপির মনে হলো চিঠিগুলো খুলে পড়ে। কিন্তু সে তা করলো না। ঘর বন্ধ করে মোমবাতি জ্বালিয়ে একটা একটা করে চিঠি খামসমেত সে পুড়িয়ে দিলো। ভেবেছিল, ছাইটুকুন ফেলে দেবে বাথরুমে। কেউ কিছু বুঝবে না। কিন্তু বাতাসে উড়ে উড়ে পুরো ঘর ছাই-ধূসরিত হয়ে পড়লো।

অপির পরীক্ষার ১৫ দিন বাকি। সে ঠিক করলো, সে নব্বিরের সঙ্গে পার্টনারশিপ করে পড়বে। সারাদিন লাইব্রেরিতে দুজন পড়ে, সন্ধ্যায় নব্বির ওকে পৌঁছে দিয়ে যায়। বাসায় এসে দেখে, তিনটা খাম পড়ে আছে।

অপি বললো, 'নব্বির দোস্ত, একটা কাজ করে দিবি? একটা নম্বরে ফোন কর। ফোন করে বল, অপির সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেছে। কাইন্ডলি জ্বালাবেন না ওকে। দোস্ত, এই উপকারটা করবি?'

নব্বির ভয় পেয়ে গেলো। তার কাজিনের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। মেয়ে লন্ডনে থাকে। ব্রিটিশ সিটিজেন। এই সুর্বণ সম্ভাবনাটা অপির জন্যে না নষ্ট হয়ে যায়।

'আরে পাগল। ভয় পাচ্ছিস কেন? আমার তোকে বিয়ে করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই। শুধু একটা ফেউ তাড়াতে চাই।'

নব্বির ফোন করলো। কার্ড ফোন থেকে অপির শেখানো বুলি তোতাপাখির মতো মুখস্থ বললো। ফারুক শুনলো, বশীভূত বালকের মতো বললো, 'কংগ্রাচুলেশনস। ঠিক আছে। জ্বালাবো না।' ফোন রেখে নব্বির বললো, 'অপি, তোর সঙ্গে আমি আর পড়ছি না। তুই একলা একলা পড়।'

www.shopnil.com

'উনি কী বললেন?'

'বললেন, কংগ্রাচুলেশনস। ঠিক আছে আর জ্বালাবো না।'

'বলেছে যখন নিশ্চয় জ্বালাবে না। থ্যাংক ইউ নব্বির। যা। তোর সঙ্গে পড়ার আমার আর দরকার নাই।'

অপি রিকশায় উঠলো। বললো, রিকশাঅলা ভাই, আসাদগেট চলেন। রিকশা আসাদ গেটের দিকে যাচ্ছে। আকাশে মেঘ। অসময়ে বৃষ্টি হবে মনে হয়। কক্সবাজারে নিম্নচাপ দেখা দিয়েছে।

আজকের দিনটাই কেমন মনমরা।

ভালো লাগছে না। কিচ্ছু ভালো লাগছে না।

আসাদগেট আসার আগেই আকাশ হঠাৎ কালো কুচকুচে হয়ে গেলো। ঝপঝপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করলো। অপি বললো, 'কী ভাই পর্দা নাই?'

'না আপা।'

অপি খুশি হলো। মাথার উপরে হুড আছে। বৃষ্টি আর দমকা হাওয়া হুডের আড়াল মানছে না, অপি ভিজে যাচ্ছে। জলের ছিটা তার জ্বলন্ত চোখেমুখে স্নেহের মতো লাগছে।

বললো, 'আপনি এখন ওয়ারি চলেন। বেশি বেশি ভাড়া দিয়ে দেবো।'

রিকশাঅলা রিকশার গতিমুখ বদল করলো।

আকাশ বাতাস শাদা করে বৃষ্টি হচ্ছে। রাস্তার পানিতে বৃষ্টির পানি জমে দৌড় শুরু করেছে। জমে থাকা পানিতে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে ওপরে লাফিয়ে উঠছে। শক্তির একটা পদ্যে একে বলা হয়েছিল অভিমানী পানির গাল ফোলানো।

আবার শক্তির পদ্য। আবার তার স্মৃতি।

অপির কাঁদতে ইচ্ছে করছে। এই সুযোগ। বৃষ্টির পানিতে তার অশ্রু ধুয়ে মুছে যাবে। কেউ টেরটি পাবে না। অপি কাঁদতে লাগলো। বুকের সমস্ত ভার সে আজ কেঁদেই লাঘব করবে।

ফারুকের জীবনটা এলোমেলো হয়ে গেছে। বাসায় বুবুর মুখের দিকে সে তাকাতে পারে না। দুলাভাইয়ের সামনে পারতপক্ষে পড়ে না। তাদের যে শোক, তা অপূরণীয়। রাদ-শাদের কথা মনে হলে তার নিজের সমস্ত শরীর এলিয়ে পড়ে, নিখিল জগত শূন্য বলে মনে হয়। এখন যুক্ত হয়েছে অপিহীনতা। একটা ফোলানো বেলুন দপ করে বুঁজে গেলো। নদী যদি হয় রে ভরাট, কানায় কানায়, হয়ে গেলে শূন্য হঠাৎ, তাকে কি মানায়। অপির মতো লক্ষ্মীধরনের মেয়ে হঠাৎ করে বদলে গেলো। একদিনে কেউ ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে যেতে পারে! তার সবচেয়ে বড়ো দুঃখ তাকে অপি জানালো না, কী তার অপরাধ। একটা ছেলে ফোন করে বললো, আমার সঙ্গে অপির বিয়ে হয়ে গেছে, আপনি আর জ্বালাবেন না। ঠিক আছে জ্বালাবো না। আমি কি ইভটিজার। অনিচ্ছুক মেয়ের পেছনে লেগে থাকবো! ছি ছি।

অপিই তার জীবনের প্রথম প্রেম, একমাত্র প্রেম। অপির কাছ থেকেই সে শিখেছে কীভাবে ভালোবাসতে হয়, কীভাবে আদর করতে হয়।

তার অফিসের র‍্যাকে অপির একটা ছবি ফ্রেমে লাগানো ছিলো, সে সরিয়ে ফেললো। তার

কলজে যেন শতধা হয়ে পড়ছে।

তার নিজের শোওয়ার ঘরটিতেও অপির কতো স্মৃতি। কতো কতো বই অপি তাকে কিনে দিয়েছে। দুটো ছোট্ট কাচের বিড়াল সে কিনে দিয়ে বলেছিল— একটার নাম ফা, আরেকটার অ। দুটো মিলে অফা।

নদী বেয়ে চলে যায়। নদী মরে গেলে নদীর বুকে বালিতে রয়ে যায় ঢেউয়ের দাগ। পাখি উড়ে চলে গেলে পাখির পালক পড়ে থাকে। উইড়া যারে শুয়াপাখি, পইড়া থাকে ছায়া। তার ড্রয়ার ভর্তি অপির কতো চিঠি। এক মুহূর্ত চোখের আড়াল হলে সে কতো আকুল হয়ে উঠেছে। কে বেশি ভালোবাসে, এই নিয়ে কতো ছেলেমানুষী প্রতিযোগিতা। ফারুক ড্রয়ার খোলে, চিঠিগুলো নাড়ে চাড়ে, পড়ে। তার মনে পড়ে যায় শক্তি একটা পদ্য—

আমার কাছে এখনো পড়ে আছে
তোমার প্রিয় হারিয়ে যাওয়া চাবি
কেমন করে তোরঙ্গ আজ খোলো?

থুৎনি-পরে তিল তো আজো আছে
এখন? ও মন, নতুন দেশে যাবি?
চিঠি তোমায় হঠাৎ লিখতে হলো।

চাবি তোমার পরম যত্নে কাছে
রেখেছিলাম, আজই সময় হলো—
লিখিও, উহা ফিরত চাহো কিনা?

অবান্তর স্মৃতির ভিতর আছে
তোমার মুখ অশ্রু-ঝলোমলো
লিখিও, উহা ফিরৎ চাহো কিনা?

ফারুক বিড়বিড় করে, একা একা পায়চারি করে ঘরে, বারান্দায় এসে দাঁড়ায়, ঘরের ভিতরে এসে পানি খায়, দরজা বন্ধ করে সিগ্রেট খায়, গোপনে হুইস্কির বোতল খোলে, দরজা বন্ধ করে পান করে। মদ্যপান করলে ইদানীং তার ভালোও লাগে, মাথাটা ঝিমঝিম করে। তখন তার বেদনাগুলোও একটা আকার পায়। বাতি নিভিয়ে দিয়ে জানালা দিয়ে দেখে রাতের ঢাকা। রাস্তার সোডিয়াম আলো কেমন বিবর্ণ করে রেখেছে ঢাকাকে। কুকুরগুলো কেমন খাপছাড়া দৌড়ুচ্ছে। পাহারদার হুইশেল দিয়ে চিৎকার করে উঠছে— হৈ।

অপির দেওয়া ক্যাসেটগুলোর একটা সে ক্যাসেট প্লেয়ারে ঢুকিয়ে দেয়। খুব নিচু কণ্ঠে গেয়ে চলেছেন হুইটনি হিউস্টোন—

www.shopnil.com

If I should stay
I would only being your way
So I'll go but I know
I'll think of you every step of way
And I will always love you
will always love you

I will always love you
I will always love you
I will always love you.

ফারুক কেঁদে চলে। পুরুষের নীরব কান্না। একমাত্র রাত্রি জানে, নীরবতা জানে, জানালার শার্সিতে হেলে পড়া চাঁদ জানে, পাতায় পাতায় জমে থাকা শিশিরের মতো এই পবিত্র নিঃশব্দ অশ্রুপাতের কাহিনী।

আই উইল অলওয়েজ লাভ ইউ— হুইটনি হিউস্টোনের গান বেজে উঠলো হাসিবাড়িতে, অকস্মাৎ, মাঝরাত্রিতে। ঘুম ভেঙে গেলো অপির। প্রচণ্ড একা লাগছে। অনন্ত আকাশের নিচে এই দুনিয়ার এই ঘরে এই বিছানায় সে এক একাকী সত্তা। তার খুব করে মনে পড়তে লাগলো ফারুকের কথা। আধো অন্ধকারে সে অনুভব করলো ফারুক এসেছে এই ঘরে। বসে আছে তার শিয়রের কাছে। তার শুশ্রূষাময় হাত রেখেছে অপির দগ্ধ তপ্ত কপালে।

অপি বললো, 'ফারুক, জানা সোনা, তুমি কি রাগ করেছো?

ফারুক বললো, 'পাগলি। আমি কখনো তোমার ওপর রাগ করেছি? কিন্তু সোনা, তুমি তোমার কথা রাখলে না কেন? তুমি না বলেছিলে চিরদিন তুমি আমাকে ভালোবাসবে।'

অপি বললো, 'আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি ফারুক। খুব। তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। আমি চিরটা দিন তোমাকে ভালোবেসে যাবো। তোমাকে যাতে সারাটা জীবন ভালোবাসতে পারি, সেজন্যেই তো তোমার কাছ থেকে দূরে দূরে থাকি, তুমি বোঝো না।'

ফারুক বললো, 'না, আমি অতোশত বুঝতে চাই না। এখন আমি তোমাকে কাছে পেতে চাই। তোমার চুলে বিলি কাটতে চাই। তোমার হাতের চুড়ি নিয়ে খেলতে চাই। চাই সারারাত ফোনে তোমার সঙ্গে গল্প করতে।'

অপি বললো, 'পাগল, তা কি আর হবার আছে? এই শোনো, তুমি অমন শুকিয়ে গেছো কেন? তোমার চোখের নিচে কালি, মাথার চুল এলোমেলো, শেভ করোনি, ব্যাপার কী? শরীরের দিকে যত্ন রেখো।'

ফারুক বললো, 'আয়নার নিজের চেহারা দেখো না? কী রোগা হয়ে গেছো তুমি! গায়ের সোনার রং ময়লা হয়ে গেছে।'

অপি বললো, 'ফারুক তুমি একটা বিয়ে করো। লক্ষ্মী দেখে একটা মেয়েকে। বউকে খুব ভালোবাসবে। সেও তোমাকে ভালোবাসবে খুব।'

অপি ডুকরে কেঁদে উঠলো। ঘুম তাকে শান্তি দিচ্ছে না, অঘুম তাকে শান্তি দিচ্ছে না, স্বপ্ন তাকে ব্যথিত করছে, কল্পনা তাকে শান্তি দিচ্ছে। মরীচিকার মতো এইসব কল্পনা। সে গলা ছেড়ে কাঁদবে আজ! যে শোনে শুনুক।

দাদির ঘুম ভেঙে গেলো কান্নার শব্দে। তিনি উঠে বসলেন। আবছা অন্ধকারে ক্রন্দরতা নাতনিকে লক্ষ্য করলেন। মেয়েটার কতো কষ্ট! এতোটুকুন বাচ্চা মেয়ে, তার পালকের মতো শরীর নিয়ে কষ্ট সহ্য করছে।

তিনি উঠে অপির বিছানায় গেলেন, তার পাশে বসলেন। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন, প্রশ্রয় আর সান্ত্বনা পেয়ে অপির সব প্রতিরোধ খড়কুটোর মতো ভেসে গেলো অশ্রুর ঢলে।

দাদি বললেন, 'অপি, তুই কি সব জেনে গেছিস। তোর অসুখের কথাটা!'

অপি অনেক কষ্টে কান্না প্রশমিত করে বললো, 'হুঁ।'

'তাহলে তুই ফারুককে সব খুলে বলছিস না কেন? একা একা কেন বয়ে বেড়াচ্ছিস এই যন্ত্রণা!'

'দাদি, আমি জানি ও খুব ভালো ছেলে। আমার অসুখের কথা শুনলে ও কেবল একটা হাসি দেবে। বলবে, দুরো পাগলি। এই জন্যে তুমি এতো নাটক করলে। ও সব মেনে নেবে সহজ ভঙ্গিতে।

দাদি বললেন, 'তাহলে?'

অপি উঠে বসলো। তার সমস্ত চুল এলোমেলো। সে মুখের ওপর থেকে চুল সরিয়ে বললো, 'কিন্তু ওর বুকের ভেতর জমে থাকবে একটা দীর্ঘশ্বাস। দিন যাবে। ওই দীর্ঘশ্বাসটা আরো বড়ো হবে। ওর খুব বাচ্চার শখ। ওর বুবু চান তাঁর ভাস্তে ভাস্তি হোক, যাদের মুখ চেয়ে তিনি বাঁচবেন। ওর মা চান নাতি-নাতনির মুখ দেখতে, যাতে বংশের ধারাটা থাকে। এইসব চাওয়া আমি মেটাতে পারব না। আমি ছোট হয়ে থাকবো। পাশাপাশি কাছাকাছি থাকতে থাকতে ও আস্তে আস্তে আমার ওপর বিরক্ত হতে শুরু করবে। আমার প্রতি ওর ভালোবাসা কমে যাবে।'

কথা বলতে গিয়ে কথার তোড়ে অপির অশ্রু শুকিয়ে এলো। তাকে এখন অনেক শক্ত মনে হচ্ছে।

সে দাদির দিকে তাকিয়ে বললো, 'জেনে শুনে আমার প্রতি ওর ভালোবাসা আমি কমে যেতে দিতে পারি না। আমি আমার ভালোবাসার জন্যে ওর ভালোবাসার নাগাল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি। আমি হেরে গেছি। কিন্তু আমাদের ভালোবাসাকে হেরে যেতে আমি দেই নি।'

আকাশ ডাকছে। বিদ্যুত চমকে উঠছে, তার আলো ঘরে চকিত পলক ফেলে যাচ্ছে। ফের বৃষ্টি এলো ঝমঝমিয়ে। ল্যাম্পপোস্টের আলোয় বাইরে বাগানটা দেখাচ্ছে অন্য রকম। বাতাসে জলের ঝাপটায় গাছগুলো কী ভীষণ মাথা ঝাকাচ্ছে। শিউলি ফুলের গাছটা, কামিনী ফুলের ঝাড়টা সদ্যস্নাতা রমণীর মতো চুল ঝাড়ছে। সন্ধ্যামালতির দুর্বল ডালগুলো লেপ্টে গেছে জলমাটি কাদার সঙ্গে। জানালায় দাঁড়িয়ে দুই রমণী তাকিয়ে দেখছে সেই দৃশ্য।

ফের বিদ্যুত চমকে উঠলো।

অপি দেখলো দাদির চোখে জল।

www.shopnil.com

শোনো উদ্ধারকারিনী
আমিও আসলে অন্ধ-- কেবল
মুখেই বলতে পারিনি।

দাদি বললেন, 'বুবু একটা গল্প শুনবি!'

অপি বললো, 'বলো!'

দাদি বললেন, 'সে আজ থেকে প্রায় আধ শ' বছর আগের গল্প। একটা চৌদ্দ/পনেরো বছর বয়সের মেয়ে। ক্লাস সেভেনে পড়ে।

মেয়েটির বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার গাঁয়ে। সে এক অপূর্ব গ্রাম। সবুজের কী বিশাল সমারোহ। বাড়ির পাশে কলকল করছে পানি। গামছা দিয়ে মাছ ছাকার উৎসবে তুমি নেমে পড়ো। সারা গা কাদায় মাখামাখি। কিছুদূরে তিতাস নদী। গোকর্ণে গেলে দেখতে পাবে নৌকা বাইচ। বাবার হাত ধরে দেখতে গেলে, ভিড়ে হারিয়ে যাওয়ার ভয় আছে, আঙুল ধরে থাকো বাবার।

মেয়েটি ওই গ্রাম ছেড়ে গেলো ঢাকায়। নানা বাড়িতে। নানা সোলায়মান খাঁ। সেগুনবাগিচায় তার বড়ো কোঠাবাড়ি।

মেয়ে পড়ে নারী শিক্ষা মন্দিরে। টিকাটুলিতে স্কুল। টমটমে চড়ে স্কুলে যেতে হতো। স্কুলে মুসলমান ছাত্রী নেই বললেই চলে। স্কুলের ভেতরে বিশাল বিশাল গাছ, একটা ঝাঁকড়া বকুল গাছ ছিলো, তলাটা ছিল বাঁধানো, ঠাণ্ডা শান, বকুল ছড়িয়ে কী অদ্ভুত গন্ধ হতো, সুঁই সুতো নিয়ে মেয়েটি স্কুলে যেতো, মালা গাঁথতো বসে বসে। আর বাঁধানো শানে বসে মেয়েরা কার্ড খেলতো, পাঁচগুটি খেলতো।

স্কুলের শুরুতেই হতো অ্যাসেম্বলি। ঝাঁকড়া বটগাছের নিচে আলো-ছায়ায়। বটগাছটা তরুণ, লাল ফলে ভরা, পাখিদের কিচিরমিচির লেগে থাকতো তাতে। আর বটফল খেয়ে মাঝেমধ্যে ছাত্রীদের মাথায় আশীর্বাদ বর্ষণ করতো পাখিরা। স্কুলের হেডমিসট্রেস ছিলেন মঞ্জুশ্রী দাশগুপ্ত। গানের শিক্ষিকা ছিলেন রেখাদি। অ্যাসেম্বিলিতে গান হতো,

'আজ ধনী গরিব সবাই সমান। আয় রে হিন্দু, আয় মুসলমান—
আজকে সকল কাজ পড়ে থাক, আয়রে লাখে লাখে।।
আজ দাও গো সবার দুয়ার খুলে, যাও গো সকল ভাবনা ভুলে—
সকল ডাকের উপরে আজ মা আমাদের ডাকে।'

রবীন্দ্রনাথের গান।

রবীন্দ্রনাথের নাম এভাবে মেয়েটির জানা হয়, তার গান শেখা হয়। তবে ইশকুলের গানের ক্লাসে সে খুব ভালো নম্বর পেতো না। দিদিমণি বলেছিলেন, বাসায় গান শিখলেও তো পারো।

মেয়েটি একবার কী একটা ছুটিতে গেলো বাড়ি। স্থানীয় জমিদার বাড়িতে নাটক হচ্ছে। শখের থিয়েটার। সেই অনুষ্ঠানের শুরুতে একজন তরুণ গাইলো রবীন্দ্রসঙ্গীত। ছেলেটা নাকি এই বাড়িতে নিয়মিত গানের একটা আসরও খুলেছে। বাসায় ফিরে মেয়েটি বললো, 'আব্বাজান, আমি গান শিখবো। ওই বাড়ির গানের আসরে যাবো।'

ছেলেটির নাম ধরা যাক নীহারেন্দু চৌধুরী। মেয়ে যতোদিন বাড়িতে আছে, ততোদিন সে যাক তবে ওই গানের আসরে। গান শিখতে গিয়েই মেয়েটি বুঝলো, সঙ্গীতের চেয়ে সঙ্গীতের শিক্ষকই তার বেশি প্রিয়। কখন ক্লাস শুরু হবে —সারাদিন শুধু অস্থির অস্থির লাগে, নীহারের কথাই সে সারাটিক্ষণ ভাবে।

ছেলেটিও এখন চলে আসে মেয়েটির বাড়িতে, মাঝেমধ্যেই।

ছুটি শেষ হয়ে আসছে, মেয়েটিকে ঢাকায় ফিরতে হবে পরদিন। গানের ক্লাস শেষে মেয়েটি আর ওঠে না, তার চোখে জল। ছেলেটি সব বুঝলো। বললো, আর ক'টা দিন থেকে ভালো করে শেখা হলে যেও।

এরপর লোকচক্ষুর আড়ালে ছেলেটি আর দেখা করতো পরস্পরের সঙ্গে। মেয়েটি ছেলেটির জন্যে সেলাই করে নিয়ে গিয়েছিল একটা ফুলতোলা রুমাল।

একবার জমিদারদের ফলের বাগানে, অন্ধকার ঝোপঝাড়ের আড়ালে, শানবাঁধানো কুয়াতলার রেলিঙে দুজনে বসে গল্প করছে, গ্রামের রক্ষাকর্তারা ব্যাপারটা দেখে ফেললেন। দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে গেলো।

আব্বা বললেন, কাল সকালেই তুমি ঢাকায় যাবে।

সব যোগাযোগ বন্ধ। ছেলেটি গোপনে চিঠি পাঠালো মেয়েটির কাছে। প্রস্তুত থেকো। কাল ভোরবেলা, আজান দেবার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে বাজপড়া জামগাছটার নিচে। মেয়েটি প্রস্তুত হচ্ছে। যাবো। যেতে হবে। একা।

কিন্তু শুধু তো ওই দুটো হৃদয়ে নয়, তখন ঝড় বহে যাচ্ছে নৃশংস ভয়াল কালবৈশাখীর মতো। সারাটা দেশের ওপর দিয়ে। সে ছিলো এক ভীষণ কাল।

সারা দেশে শুরু হয়ে গেছে সাংঘাতিক গোলযোগ। কলকাতার প্রচণ্ড দাঙ্গায় মারা গেছে অগণিত মানুষ। তার প্রতিক্রিয়ায় জ্বলে উঠেছে বাড়ির কাছের নোয়াখালী। সাম্প্রদায়িক হিংসার আগুনে পুড়ে যেতে লাগলো মানুষের সাজানো বাড়িঘর, কাটা পড়লো কতো শিশুর শরীর, রক্তে-আগুনে-আর্তনাদে সে নারকীয় বীভৎসতা।

মেয়েটির কানেও যাচ্ছে কিছু কিছু।

সেই এই রাত। একেকটি মুহূর্ত যাচ্ছে, যেন সময়ের কপালের শিরা দপদপ করছে। এমন সময় চৌধুরী বাড়ি থেকে এলেন সে বাড়ির কর্ত্রী, দেখা করলেন মেয়েটির সঙ্গে। হাতজোড় করে তাকে বললেন, 'মা, তোমার কাছে আমি একটা মিনতি নিয়ে এসেছি। একটা জিনিস তোমার কাছে ভিক্ষা চাই। বলো মা, এ ভিখারিনীকে তুমি ফেরাবে না।'

'জি কাকিমা বলুন।'

'তুমি আমার প্রাণভিক্ষা দাও। আমার আর আমার গোটা পরিবারের। চারদিকে আগুন জ্বলছে। ভয়ে আমরা মৃতপ্রায়। এ অবস্থায় যদি তুমি নীহারের সঙ্গে চলে যাও, আমরা কি

www.shopnil.com

বাঁচবো মা? বলো মা, তুমি নীহারের সঙ্গে যাবে না। বলো।'

চারদিক তখন ভীতসন্ত্রস্ত। এক বাড়িতে আগুন লাগলে তার আঁচ, লালচে আলো, হৈ হল্লা যেমন করে পাশের বাড়িকে বিহ্বল করে তোলে, সবাই তখন তেমনি বিহ্বল। রোজ গুজব আর গুজব। কলকাতায় মুসলিম মেয়েদের মেরে তাদের মুখে মুসলিম পুরুষদের কর্তিত পুরুষাঙ্গ ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে— এমনি গুজব। দি গ্রেট কালকাটা কিলিং।

এই নিস্তরঙ্গ শান্তি প্রিয় গ্রামে দাঙ্গা হয়নি। তার কারণে দাঙ্গা বাধুক, মেয়েটি কি তা হতে দিতে চায়!

মেয়েটি বললো, 'আপনি বাসায় যান কাকিমা। আমার তরফ থেকে আপনাদের কোনো বিপদ হবে না।'

মেয়েটি সকালবেলা ছেলেটির কাছে গেলো না। পূর্বনির্ধারিত জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ছেলেটি ফিরে গেলো।

'অপি, ওই মেয়েটির কথা ভাব, তোর সমস্যার সঙ্গে তার সমস্যাটার মিলের একটা জায়গা আছে। সেটা হলো, তাদের চলার পথে যে বাধা, যে কাঁটা, সেটার জন্যে তারা নিজেরা দায়ী নয়। তুই বাঁধা নিয়তির কাছে। আর ওই মেয়েটি বাঁধা সামাজিক ভেদের কাছে।'

'দেশভাগের পরপরই নীহাররা চলে গেলো ওপারে। কোথায় আছে, কেমন আছে— মেয়েটি জানে না। ওই বছরই মেয়েটির বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। এই গোপন বেদনার কথা মেয়েটি আর কোনোদিনই কাউকে বলে নি। শুধুই হেসে গেছে। হাসতে অসুবিধা হয়নি তো!'

বৃষ্টি থেমে গেছে। ল্যাম্পস্টের আলোয় বৃষ্টিভেজা গাছের পাতা চিকচিক করছে।

'চল বুবু ঘুমুতে চল। তোর না সামনে পরীক্ষা। এবার তো তোকে ফার্স্টক্লাস পেতেই হবে। তোর জীবনটা তো সামনে তোকেই গড়ে নিতে হবে।'

অপি পরদিন থেকে আবার হাসিখুশি। হাসিবাড়ি তার শ্রী ফিরে পেয়ে গেছে। এ বাড়ির কারো মনেই কোনো বেদনা নেই, দীর্ঘশ্বাস নেই।

অপিকে এরপর আর কেউ কখনো কাঁদতে দেখেনি।

Thank You For Visiting
www.shopnil.com

A New Dream , A New Destination
www.shopnil.com
we request you to join our text and voice chat